"সমস্ত দেশের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ঘটনা সাক্ষ্য দেয় ধর্মই মানুষকে পতিত, দাস, উপেক্ষিত এবং ঘৃণাস্পদে পরিণত করেছে। ভারতীয় মানবতাকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য কোন কিছুর যদি বেশি নষ্টামি থাকে তবে তা ধর্মের।"

—রাহুল সাংকৃত্যায়ন

গণবার্তা

সূচি.......... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়	১
দিল্লি প্রাসাদ কূটে বাদশাজাদার....	১
দেশে বিদেশে	২
গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও স্বৈরতন্ত্র	৩
মুসলিম মহিলাদের ছবি নিলামে	৪
বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ....	৫
লকডাউনে 'কুনাট্য'..,,	৫
রাজ্যের কৃষকের আত্মহত্যা : একটি তথ্যানুসন্ধানী রিপোর্ট	৭
রাজ্যে বাড়ছে কৃষক আত্মহত্যা	৮

68th Year 41th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 1st Jan. & 8th Jan. 2022 Joint Issue

সম্পাদকীয়

আসন্ন বাজেটে মানুষের জীবনে অন্ধকার আরো ঘনীভূত হবে

আর মাত্র চার সপ্তাহ পরেই ২০২২-২৩-এর বাজেট সংসদে পেশ করবে মোদি সরকার। ইতিমধ্যেই অতিমারির তৃতীয় ঢেউ আগের দুটির তুলনায় বেশি দ্রুতগতিতে সারাদেশে ছেয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আন্দাজ করা যাচ্ছে না আগামী দু'মাসের মধ্যে ওমিক্রন ভাইরাস প্রভাবিত মহামারি কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে। আমাদের দেশে বাজেট সম্পর্কিত উৎসাহ-উদ্দীপনা গত দু'দশক ধরে কমে আসছিল। মোদি সরকারের আমলে বাজেট বলতেই সাধারণত একটা ভয় দেশবাসীর মনে আসে যে, আরো কত দিক থেকে সাধারণ মানুষের ওপর নয়া উদারবাদী আগ্রাসনের সাঁড়াশি চেপে বসবে।

যাহোক রুটিনমাফিক বাজেট পেশ করার দায়িত্বে নীতি আয়োগ এবং মোদি-অমিত শাহ'র নির্দেশে সরকারি আমলাকুল। মোদী অনুমোদিত এবং অর্থনীতিবিদরা যেভাবে মহামারির দ্বিতীয় ঢেউ একটু কমছে ঘোষণা করে দেশের অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর কথা বলেছিলেন তা কার্যত অলীক কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনিতেই একের পর এক মহামারি এবং লকডাউন-এর ধাক্কায় দেশের মানুষের মনে আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়ে আছে। এর মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে নতুন ভাইরাস ওমিক্রনের দ্রুত সংক্রমণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার মতো স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং বিপন্ন কোটি কোটি মানুষকে জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা দিতে কার্যত ব্যর্থ কেন্দ্রীয় সরকার। অনেক রাজ্য সরকারই আংশিক লকডাউনের পথ গ্রহণ করেছে। যানবাহন চলাচল যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এর ফলে পরিষেবা এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ, বাড়ছে বেকারত্বের হার। অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রে সার তেল বীজের দাম শুধু বাড়ছে না, কালোবাজারে কৃষকের হাতের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। তার মধ্যে এক বছরের বেশি সময় ধরে চলেছে কৃষকদের আন্দোলন। ঘোষণা মতো তিনটি আইন মোদি প্রত্যাহার করলেও এখনো পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে তা কার্যকর করা হয়নি।

বাজেটের কর্মকর্তাদের কাছে তিনটি মূল সমস্যা অদ্ভুতভাবে সমাপতিত হয়েছে। প্রথমত, অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতি, দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, এবং এই দুটি বিপরীত ধাক্কা রুখে দেওয়ার মতো দূরদর্শী আর্থ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির চূড়ান্ত অভাব। সাধারণত কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়লে বাজারে কেনাকাটার হার কমে যায় এবং জিনিসপত্রের দাম কমে। কিন্তু এর বিপরীতটা ঘটার কারণ ফাঁপানো লগ্নিপুঁজির অর্থনীতির দুধের সরটুকু খাচ্ছে মাত্র গুটিকয়েক মানুষ ও পরিবার। সমস্ত সম্পদ জমা হচ্ছে তাদের হাতে। ইতিমধ্যে আমাদের দেশ থেকে পরিষেবা রপ্তানি কমছে দ্রুতহারে কারণ, ওমিক্রন সংক্রমণের ধাক্কায় ইউরোপ আমেরিকায় আর্থিক পুঁজির বাণিজ্য থমকে দাঁড়িয়েছে। মাঝখানে গত দু'মাসে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি কিছুটা বাড়লেও আমদানির তুলনায় তা অনেক কম। আমদানি-রপ্তানির ঘাটতি ছিল ডিসেম্বরে বাইশ বিলিয়ন ডলার।

সরকারি তথ্যে জিএসটি সংগ্রহ ভালো হলেও কার্যত এই সংগ্রহের ধাক্কায় ছোট ও মাঝারি শিল্প ভীষণ বিপর্যস্ত। উৎপাদিত পণ্যের বাজারে বৃদ্ধির হার দেখে মোদি সরকার অর্থনীতির ইউ টার্ন বলে মাতামাতি করেছিল। ওমিক্রনের তৃতীয় ঢেউ এসে সেই প্রচার আর উৎসাহের বেলুন চুপসে দিয়েছে। একথা ভুললে চলবে না অর্থনীতির প্রতিটি পরিসরেই এখনো পর্যন্ত নোট বন্দি, অপরিকল্পিত হঠকারী জিএসটি নীতি আর মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে সারা ভারত ব্যাপী লকডাউন নিঃসন্দেহে মোদি-অর্থনীতিটিকে একদম নড়বড়ে করে দিয়েছে। এর মধ্যে যথেষ্ট প্রচার করে যে তথাকথিত স্টিমুলাস দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মক্ষেত্রে, পাশাপাশি ঋণের অর্থের যে গ্যারান্টির কথা ভাবা হয়েছিল তার ব্যর্থতার ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলির অনাদায়ী ঋণের বোঝা আরো বেড়ে চলেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার পর্যাপ্ত উন্নয়ন হয়নি। দেশের একশো শতাংশ মানুষের দুটি ডোজ জোটে নি। অবিলম্বে তৃতীয় বুস্টার ডোজের ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব। সাধারণ মানুষের আতঙ্ক কমার কোনো লক্ষণই নেই। অন্তত মোদি জমানায় তা অসম্ভব।

দিল্লি প্রাসাদ কূটে বাদশাজাদার নিদ্রা যেতেছে টুটে...

ভারতের প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রস্ত। ইদানিং তাঁর আচার আচরণও বেশ অসংলগ্ন। স্বাভাবিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসুলভ আচরণ অবশ্য নরেন্দ্র মোদির অভ্যাসে দীর্ঘকাল যাবৎ লক্ষ করা যায়নি। তিনিও সম্ভবত ২০০১ সালে গুজরাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হবার পর থেকেই তাঁর পূর্বাশ্রম অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একনিষ্ঠ ও উগ্র প্রচারকের কদর্য অভ্যাসগুলি বর্জন করার বিষয় ভাবেন নি। শোনা যায়, গুজরাত রাজ্যের বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা কেশুভাই প্যাটেলকে ছাঁটাই করে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অন্য কোনও নাম বিবেচনা কালে সেই সময় আর এস এস প্রেরিত বিজেপি'র অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদির প্রথমে নাম ভাবাই হয় নি। নাগপুরের কর্তারা নাকি বিশেষভাবে হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণের মডেল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন গুজরাত রাজ্যকে। তাঁরাই গোঁ ধরেছিলেন মোদিকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসিয়ে হিন্দু রাজ্য হিসেবে একটি মডেল নির্মাণের স্বপ্ন পূরণ করতে।

দিল্লির রাজনৈতিক মহলে শোনা যেত যে, দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বা 'লৌহমানব' বলে আখ্যায়িত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি প্রমুখ কোনভাবেই মোদিকে মুখ্যমন্ত্রী করার পক্ষে ছিলেন না। তাঁদের যুক্তি ছিল সংসদীয় কাজকর্মে মোদির কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এবং তিনি ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি রাজ্য সরকার চালাতে পারবেন না। এমন পরিস্থিতিতে 'আর এস এস প্রিভেইলড়'। অর্থাৎ, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর এস এস-এর নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মোদির উদয় ঘটেছিল গুজরাত সরকারের নেতৃত্ব দিতে। তিনি নিষ্ঠাভরে আর এস এস-এর কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই গুজরাতে পরিকল্পিত গণহত্যা। অক্টোবর ২০০১ থেকে ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রাথমিকস্তর হিন্দু রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার পরীক্ষা নিরীক্ষায় আর এস এস সফল। আর মোদি নামক এক প্রচারক মানবিক বোধ বর্জিত হয়ে চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে মুসলমান নিধনে হাত পাকালেন।

কিছুদিন আগে গত বছরের একেবারে শেষের দিকে হরিদ্বারে হিন্দুত্ববাদী স্বনিয়োজিত উগ্র সাম্প্রদায়িক এক হিন্দু সংসদ নিদান দিয়েছে যে, অহিন্দুদের খতম করতে হবে। দেশ থেকে মেরে তাড়াতে হবে। ওরা নাকি একশোজন স্বেচ্ছাসেবক বেছে নিয়ে তাদের মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলমান খতম করবে। নির্দেশ দিয়েছে যে, হিন্দুত্ব রক্ষার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক আগ্নেয় অস্ত্র সংগ্রহ করে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সারা দেশে যে কয়েক কোটি ইসলাম ধর্মীয় মানুষ আছেন তাঁদের নির্বিচারে হত্যা করে এক ভয়াবহ ভীতিজনক আবহ নির্মাণ করতে হবে। তা করতে পারলেই বাকী সবাই প্রাণের দায়ে ভারত ছেড়ে পালাবে এবং বহু প্রতীক্ষিত হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণ বাস্তব রূপ পাবে। মোদি যা সম্ভব করেছিলেন গুজরাতে তা এখন সারা দেশে প্রযুক্ত হবে। এমনই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে ওই বহুকথিত ধর্ম সংসদে। মোদি বা আর এস এস-এর উদ্দেশ্য ছিল গুজরাতের জনগোষ্ঠীকে নির্বিচারে হত্যা করে এক চূড়ান্ত ভীতির সঞ্চার করা। যাঁরা নিহত হবার থেকে কোনক্রমে বাঁচলেন তাঁরা চিরতরে রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে হিন্দু রাষ্ট্রশক্তির প্রবল পরাক্রমের মধ্যে কৃপা ও অনুগ্রহ নিয়ে বাঁচবেন। তাঁদের কোনও নাগরিক অধিকার আর থাকবে না।

যে কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল নরেন্দ্র মোদির মুখ্যমন্ত্রীত্বের আদিকালে তাকেই এবার পূর্ণতা দেবার লক্ষ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী অপশক্তিগুলি। ২০০২ সালে তিনি ছিলেন কর্মকাণ্ডের প্রধান কুশীলব আর এখন তিনি প্রধান অনুপ্রেরণা দাতা। তাঁর যে নিষ্ঠুর এবং একগুঁয়ে মুখচ্ছবি নির্মিত হয়েছিল গুজরাতে তা-ই বিশেষ যত্ন সহকারে বর্ধিত হয়েছে। সমগ্র দেশকে আরও প্রবল যন্ত্রণা ও অস্বস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবে এই মানসিক বিকার।

বিগত কয়েকমাস যাবৎ মোদির শান্তি নেই আদৌ। দীর্ঘ এক বছরব্যাপী কৃষক আন্দোলনের চাপে পর্যুদস্ত হয়ে খান খান হয়েছে মোদির সেই সযত্ন নির্মিত ভাবমূর্তি। তাঁকে অবশেষে দেশের কৃষকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হয়েছে। তিনি যৎপরোনাস্তি বিড়ম্বনায়। কৃষক সংগ্রাম আপসহীন ভাবে চলার ফলে আর এস এস প্রচারক মোদির সাধের ধর্মীয় বিভাজন কৌশল বেশ ধাক্কা খেয়েছে। অন্যান্য সর্ববিধ ব্যর্থতা এখন নিদারুণ ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। পরপর সমস্ত নির্বাচনগুলিতে তা পঞ্চায়েত, পৌরসভা বা বিধানসভা লোকসভায় উপনির্বাচনগুলিতেও বিজেপি'র ভরাডুবি অব্যাহত। এমনকি, যে সব রাজ্যে হিন্দুভাবাবেগ প্রবল আকার ধারণ করেছিল সেসব ক্ষেত্রেও পরাভূত মোদি-অমিত শাহ'র দল। কোনও কৌশলই আর ফলবতী হচ্ছে না। মোদির নেতৃত্বে নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বিজেপি'র অন্দরে।

ভোট বড় বালাই। উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, গুজরাত, গোয়া উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে ভোটে বিজেপি'র অবধারিত পরাভব বোধে মোদি এখন মরিয়া। নিত্যদিন নতুন নতুন ভূমিকায় তিনি নিষ্ঠাভরে অভিনয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কোথাও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে তাঁর সুদৃশ্য পোশাক পরে গঙ্গায় ডুব দিচ্ছেন। অর্ঘপ্রদান করছেন তাঁর ঈশ্বরের উদ্দেশে। আবার কোথাও তিনি ডবল ইঞ্জিনের গল্প বলছেন। সর্বশেষ তিনি পাঞ্জাবের জনসভায় লোকসমাগমের ব্যর্থতা ঢাকতে বৃষ্টিস্নাত পথে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তার অভাব বলে উষ্মা প্রকাশ করছেন। তাঁর নিজের দায়িত্ব দেশের জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়া। তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে এখন সহানুভূতি আদায়ের আকাঙ্ক্ষায় নিজের নিরাপত্তা নিয়েই অলীক কু-নাট্য রচনা করে চলেছেন।

সব কিছুরই শেষ আছে!

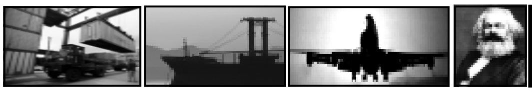

দেশে বিদেশে

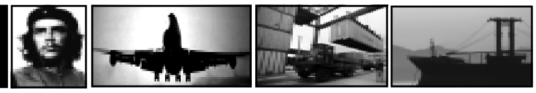

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর আবিষ্কার

গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের বহু শ্রুত বহু পঠিত পদার্থ বিজ্ঞানের এক মৌলিক সত্য আবিষ্কারের কাহিনী আমরা সবাই জানি। স্বর্ণ মুকুটের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করতে গিয়ে এই সত্যের সন্ধান পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল আর্কিমিডিস দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নগ্ন অবস্থায় ইউরেকা, ইউরেকা শব্দটি উচ্চারণ করতে করতে রাজদরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। এমন এক অভিনব আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এরও। রাজনাথ সিং-এর দাবি, মহাত্মা গান্ধী সঙ্ঘ পরিবারের তাত্ত্বিক নেতা সাভারকারকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে মুক্তির আবেদন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। একাধিক বার। রাজনাথের এই অশ্রুতপূর্ব দাবিতে সম্ভবত কবরে শায়িত ঐতিহাসিকরাও চমকে উঠবেন। বাস্তব ঘটনা এই প্রকার ঃ—

১৯১১ সালে সাভারকারের ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে প্রথম মুক্তির আবেদন পত্র (clemency petition) দাখিলের সময় গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় জেনারেল স্মার্টের (Smart) সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে সাভারকার আরও একটি মুক্তির আবেদন দাখিল করেন। ঐ মাসেই গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় কারাগারে বন্দী হন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এই বছরগুলি গান্ধী সাভারকারের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন এমন কোনও তথ্য কারো জানা নেই। দ্বিতীয়ত, মন্টেগু চেমফোর্ডের সংস্কারের ফলে ১৯১৯ সালের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে সব রাজবন্দীদের মুক্তির (Amnesty) প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সাভারকার সহ অন্যান্য অনেক বন্দীদের মুক্তির আবেদন বাস্তবায়নে গভর্নমেন্টের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে গান্ধী অভিযোগ করেছিলেন। গান্ধীর লিখিত অভিযোগ ছিল "Both these brother have declared their political options and both have stated that they do not entertain any revolutionary ideas and that if they were set free they would like to act under Reforms Act— ঐ একই আবেদন পত্রে গান্ধী আরও লিখেছিলেন "Sarvarkar brothers state unequivocally vocally that they do not desire independence from the British connection. On the contrary, they feel that India's destiny can be best worked out in association with the British."

তৃতীয়ত আরও একটি আবেদন পত্রে সাভারকার লিখেছিলেন, সেই আবেদনপত্রের বয়ান ছিল এইরূপ— "I and my brother are perfectly willing to giving a pledge of not participating in politics for a definite and reasonable period that the Government would indicate."

ইতিহাসের পরিহাস এমন এক সময়ে এই মুক্তির আবেদন পত্র ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছেছিল যখন গান্ধী কারাগারকেই স্বর্গে পরিণত করার জন্য দেশবাসীর কাছে উদাত্ত আহ্বান করেছিলেন। আমরা জানি গান্ধী বলেছিলেন, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে দেশের স্বাধীনতার জন্য কারাগারে যেতে হবে। দেশের মুক্তির জন্য দেশবাসীদের আমৃত্যু সব কষ্ট সহ্য করেও অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

প্রসঙ্গত সাভারকারের অনুগত ভক্তবৃন্দ সাভারকারের মুক্তির জন্য আবেদনপত্রগুলির ঘটনা চেপে যেতেই আগ্রহী। রাজনাথ সিং একই কাজ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৫৭ সাল থেকে অসংখ্য বিদ্রোহীদের আন্দামানের কারাগারে পাঠানো হয়েছিল এবং অনেকেই শহিদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান নির্বিশেষে কেবল বঙ্গে প্রেসিডেন্সী থেকেই ৪০০ জনকে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল যাঁদের গুলি করে মারা হয়েছিল বা ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। তাঁদের কিন্তু "VEER" উপাধি দেওয়া হয় নি। সাভারকারের কীর্তিকলাপ অবশ্যই কৌতুকের বিষয়। পাশাপাশি ভগৎ সিং-এর অমর কাহিনী উল্লেখ না করলেই নয়। ফাঁসিতে মৃত্যুর পরিবর্তে ভগৎ সিং বলেছিলেন "We demand to be shot dead instead of to be hanged." সঙ্ঘ পরিবারের তাত্ত্বিক নেতা "VEER" বলে অভিনন্দিত সাভারকারের মুক্তির জন্য করুণ আবেদন পত্রগুলি ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। (সংগৃহীত)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জো বাইডেন গতানুগতিক পথেই চলেছেন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিগত সাধারণ নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই-এর মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপশাসন এবং বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণগুলির আপাত অবসান হয়েছিল। বিশ্বের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু মানুষের মনে বিশেষ আশা জাগিয়ে ডেমক্র্যাটিক পার্টির জো বাইডেন নির্বাচিত হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেছিলেন যে বাইডেন তাঁর নির্বাচনী প্রচারে যে সব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন, সেগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন হলে ওই দেশের সাধারণ জনজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ প্রগতি সম্ভব হবে। দেশে যে ভয়াবহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকৃতির করাল ছায়া বিস্তৃত হয়েছিল তা থেকে মুক্ত হবে দেশ।

বাইডেন এর রাষ্ট্রপতিত্বকাল এক বছর অতিক্রম করার পর প্রগতিপন্থী মানুষদের যথেষ্ট হতাশার কারণ ঘটে চলেছে। আমেরিকার শ্রমজীবী মানুষ ও যুবক যুবতী যাঁরা, ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বাইডেনকে ঢালাও সমর্থন করেছিলেন এবং দেশ জুড়ে প্রচার করেছিলেন, তাঁরা এখন বিশেষভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। শীর্ষস্তরের মার্কিন প্রশাসন প্রায় একই ধরনের নীতি অনুসরণ করে চলেছে। বাইডেন কোনও সাহসী পদক্ষেপই করতে পারছেন না।

মূলগতভাবে ডেমক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে রিপাব্লিকান পার্টির তেমন উল্লেখজনক কোনো প্রভেদ নেই। অতীতে এই বিষয়টি বারংবারই লক্ষ করা গেছে। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতিত্বকালে যে অভূতপূর্ব নৈরাজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার পরে অনেকে মনে করেছিলেন যে নতুন রাষ্ট্রপতি নিশ্চয়ই বাঁধাধরা বা গতানুগতিক পথে চলবেন না। তাঁরা যথেষ্ট আশাহত হয়ে পড়ছেন।

প্রকৃত পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দৈত্যাকৃতি মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সই মার্কিন প্রশাসন-এর আসল পরিচালক। অবস্থাটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কোনও একজন রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে করলেই এইসব বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারবেন না। জো বাইডেন কোনো ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব নন।

আর্চ বিশপ ডেসমন্ড টুটুর দেহাবসান

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী গণ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং আজীবন উন্নত গণতান্ত্রিক প্রত্যয় অনুসরণকারী ডেসমন্ড টুটু গত ২৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে প্রয়াত হয়েছেন। এই অতি সুভদ্র মানুষটি শুধুমাত্র ওই দেশের প্রবাদপ্রতিম জননেতা নেলসন ম্যান্ডেলার কমরেডই ছিলেন না। তিনি ছিলেন ওদেশের মানুষের কাছে এক নির্মল বিবেকের উদাহরণ। নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন ১৯৮৪ সালে। বিশ্বজুড়ে পরিবেশ আন্দোলনে তিনি এক অসম সাহসী নেতার ভূমিকায়। অহিংস গণআন্দোলনে প্রত্যয়শীল মানুষটি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনিই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগানের মুখের ওপর বলতে পেরেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নীতির ফলে অশ্বেতকায় মানুষদের জীবনধারণই অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

ডেসমন্ড টুটুর জন্ম ৭ অক্টোবর ১৯৩১। তাঁর জন্মস্থান দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তর পশ্চিমে ক্লার্কসডর্প অঞ্চলে। অতি দরিদ্র পরিবারে জন্ম ডেসমন্ড এমপিলো টুটুর। মেধাবী ছাত্র এবং কৈশোর থেকেই গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ওই দেশের সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধার। তিনি এবং ম্যান্ডেলা ছিলেন অকৃত্রিম বন্ধু ও সহযোদ্ধা। তিনি কোনদিনই কোনপ্রকার ভীতিপ্রদর্শনের কাছে মাথা নত করেননি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অনেকরকম চেষ্টা করেও ডেসমন্ড টুটুকে দমাতে পারেনি। তিনি পেশা হিসেবে একসময় শিক্ষকতা করেছেন। জীবনের বেশিরভাগ সময় ধর্মীয় যাজকের চাকুরি করেছেন।

এমন এক উন্নত শির মানুষের মৃত্যু পরিণত বয়সে হলেও সমগ্র বিশ্বের মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে অতীব বেদনার।

১৯৭১-এর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হল

ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ইতিহাসের বিকৃতি সাধন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোনভাবেই এই বৈশিষ্ট্যমুক্ত হতে পারেন না। তবে তিনি বা তাঁর সংকীর্ণ রাজনৈতিক বোধ যেভাবে দেশের রাষ্ট্রপতির পদকেও মলিন করে ফেললেন তার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শে পরিচালিত হলে খুঁজে পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রপতির পদটি সংকীর্ণ বা ক্ষুদ্র রাজনীতির উর্ধে। সেই রাষ্ট্রপতিকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে পাঠালেন মোদী সরকার। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ওই দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অন্যান্য মাননীয় ব্যক্তিদের সামনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা করলেন। একবারের জন্য এই অসমসাহসী কর্মকান্ডে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির নাম কোনভাবেই উচ্চারণ করলেন না। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের সমস্ত কৃতিত্বই ভারতের সেনাবাহিনীকে দিলেন। হিন্দুত্ববাদী সামরিক স্বৈরতন্ত্রের জয়গান করলেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। আর এস এস-এর দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকট হল তাঁর ভাষণে।

ইন্দিরা গান্ধি অনুসৃত কূটনীতি ছিল বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। সেই সময় ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অসমসাহসী যুদ্ধে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারতের সরকার। ইন্দিরা গান্ধির রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ সমালোচনা থাকলেও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভুমিকা সততই প্রশংসার দাবি রাখে। অথচ ভারতের রাষ্ট্রপতি মোদীর সংকীর্ণ ও বিকৃত রাজনীতির বাহক হয়ে নিজের সম্মান পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিলেন।

পক্ষান্তরে ওই একই সভায় বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে ইন্দিরা গান্ধির ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। শেখ হাসিনা তাঁর ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করার পাশাপাশি ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানকে যথার্থ ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আন্তর্জাতিকস্তরে বা ভারত রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এ এক বিশেষ অসাফল্য বলেই বিবেচিত হতে পারে।

কোভিড সংক্রমণের ভয়াবহ পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন

দায়িত্বজ্ঞানহীন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার। রাজ্যে যখন প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন, চারটি পৌরনিগমের নির্বাচন সমাধা করতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্‌গ্রীব। রাজ্য নির্বাচন কমিশন বস্তুত অসহায় আজ্ঞাবহ। মহারানি যা বলেন তাই একমাত্র সত্য বলে মনে করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। মেরুদণ্ডহীনতার চূড়ান্ত। সবকটি পৌরনিগম অর্থাৎ, চন্দননগর, আসানসোল, শিলিগুড়ি, ও বিধাননগরে ভোটগ্রহণ ২২ জানুয়ারি। রাজ্যের বামফ্রন্ট প্রকারান্তরে এই অবস্থায় নির্বাচনের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে এই আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে নির্বাচন করার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করেছে।

উল্লেখ করা যায়, এই সবকটি পৌরনিগমের নির্বাচন হওয়া উচিত ছিল বহুপূর্বে। এত দেরিতে নির্বাচনের আয়োজনে রাজ্য সরকারের অন্যতম অজুহাত ছিল করোনার দুষ্প্রভাব। সব কটি কর্পোরেশনে তৃণমূলীদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করে দেদার দুর্নীতির সুযোগ করে দিয়েছে। আর এখন সাংঘাতিক করোনা সংক্রমণ কালে জোরপূর্বক নির্বাচন করানোর চেষ্টা করে চলেছে।

আসলে, কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে দেদার ভোট লুটের স্বাদ পেয়েছে তৃণমূলীরা। এখন দ্রুত উল্লিখিত চারটি পৌরনিগমের ক্ষেত্রেও নিশ্চিন্তে ভোট লুটের মাধ্যমে ক্ষমতালাভের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে তৃণমূলী রাজ্য সরকার।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও স্বৈরতন্ত্র

মনোজ ভট্টাচার্য

আমাদের দেশের মতো প্রচলিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্থানে থাকে সংসদ। লোকসভা ও রাজ্যসভা। সংসদের এই দুই কক্ষ বা সভাতেই রাষ্ট্র পরিচালনার মুখ্য নীতিগুলি নির্মিত হয়। এই দু'টি সর্বোচ্চ পঞ্চায়েতের সভা আহ্বান করা এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মূল দায়িত্ব দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের। সরকার পক্ষ যেসব সিদ্ধান্ত নেয় সেগুলির কাটা ছেঁড়া করা, ব্যাপক সমালোচনা করে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার অধিকার এই সভাগুলির রয়েছে। সরকার বিরোধী পক্ষের এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভূমিকা থাকে। বিতর্কে একে অন্যের যুক্তি খণ্ডন করেই ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

আবার বিরোধী মতামত সঠিকভাবে উত্থাপনের অধিকার ও সুযোগ সরকার পক্ষকেই করে দিতে হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঠিক পরিচালনায় এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনরূপ বিতর্ক এড়িয়ে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার প্রবণতা অবশ্যই বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একান্ত দৃশ্যমান অঙ্গ। এ থেকে কোনও ব্যতিক্রম অবশ্যই স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায়। এ অতীব আতঙ্কজনক এক প্রবণতা। সরকার পক্ষের যে কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কেই বিরোধী পক্ষে অন্যতর মতামত থাকতে পারে। সেইসব মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ সংসদীয় ব্যবস্থার ভিত্তি। ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থার এমন অবনমন অতীতে কখনোই হয়নি।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশের সাধারণ মানুষ, জনগোষ্ঠীর স্বার্থে কিংবা বৈদেশিক ও আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত টীকা টিপ্পনী ও কঠোর সমালোচনার সুযোগ এই বিতর্কসভাগুলিতে রয়েছে। সাংসদদের কণ্ঠরোধ করে একতরফাভাবে কোনও সরকারই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে চলতে পারে না। দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিসরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার হালচাল, বেকারত্বের সমস্যা, বৈদেশিক নীতির কারণে দেশের স্বার্থহানি প্রভৃতি প্রসঙ্গ স্বচ্ছন্দে লোকসভা ও রাজ্যসভায় আলোচিত হতে পারে। সংসদ পরিচালনার বিভিন্ন ধারা, নিয়মাবলী ও রীতি মেনেই এমন সব বিতর্ক বা আলোচনাগুলি হয়ে থাকে। সংসদীয় ব্যবস্থার দৈনন্দিন পরিচালনায় বিরোধীপক্ষের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বিরোধী পক্ষের মতামতগুলি সর্বক্ষেত্রে না মানলেও সরকার পক্ষের উচিত সেই সবগুলি গুরুত্বসহ শোনা এবং প্রয়োজনীয় উত্তর দেওয়া। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'না' বলার অধিকার অতি গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের সংসদীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক পথে দীর্ঘকাল যাবৎ দেশ পরিচালিত হয়ে এসেছে। বর্তমান কালে এন ডি এ বা বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন সরকার প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক পথে চলেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান বা একমাত্র নিয়ামক নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। তাঁর প্রধান চারিত্রবৈশিষ্ট্য একতান্ত্রিক মানসিকতা। তিনি গুজরাত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়েই বিশদে লক্ষ করা গিয়েছিল তাঁর এমন বিকৃত মানসিকতা। অন্য কোনও মতের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র সহনশীলতাও ছিল না। যা নিজে মনে করতেন, তাই একমাত্র অনুসরণযোগ্য পথ বলে তিনি সমগ্র জনগোষ্ঠীর ওপর তা চাপিয়ে দিতে কখনোই দ্বিধান্বিত ছিলেন না। অজস্র উদাহরণ উল্লেখ করেই মানুষটির এমন অগণতান্ত্রিক বা স্বেচ্ছাচারী মানসিকতার সম্যক পরিচয় পাওয়া সম্ভব। অনেকেই মনে করেন এমন মানসিক বিকৃতির মুখ্য কারণ মোদীর মনোবিকাশে আর এস এস-এর মতো একটি আদ্যন্ত ফ্যাসিবাদী সংগঠনের নিবিড় প্রভাব। উগ্র হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিতন্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক এই ব্যক্তিটি। শুধুই আত্মপ্রচার, আত্মস্বার্থ বা একান্ত সংকীর্ণ পথে দেশের বেশিরভাগ মানুষের স্বার্থহানি করা মোদীর মতো স্বৈরাচারীর উদ্দেশ্য।

২০১৪ সালে অসংখ্য মিথ্যে কথার উদগ্র প্রচার এবং অলীক প্রতিশ্রুতির সোচ্চার বিতরণের মাধ্যমে তিনি দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সকলেরই স্মরণে আছে যে, ভারতের প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি কপট আনুগত্য প্রকাশ করতে মোদী সংসদ ভবনের প্রবেশ পথে ষাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানিয়েছিলেন। বেশ ঘটা করেই সেই অভিনয় তিনি সাফল্যের সঙ্গে সংঘটিত করেছিলেন। দেশের সাধারণ মানুষের একাংশ বেশ আপ্লুত বোধ করেছিলেন মোদীর এ হেন আচরণে। কেউ কেউ অবশ্যই আলোড়িত হয়ে প্রশংসা বাক্যে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, মোদী স্বয়ং এক পাকা অভিনেতা এবং নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তাঁর কোনও জুড়ি নেই। বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রচারী ব্যক্তিত্বরা অবশ্য প্রথম থেকেই মোদীর এমন আচরণকে গভীর সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। তাঁদের কাছে ২০০২ সালের গুজরাত দাঙ্গার বীভৎসতা এবং সেই সময়কালে মোদীর ভূমিকা সম্পর্কে কোনপ্রকার ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ ছিল না। বামপন্থীদের মধ্যে মোদীর উত্থানে ভারতের কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা সম্পর্কেও কোনরূপ ভুল ধারণা ছিল না।

২০১৪ সালের পর থেকে যতদিন অতিক্রান্ত হয়েছে ততই নগ্ন হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর প্রকৃত স্বরূপ। তাঁর অতি ঘন ঘন বিদেশ যাত্রা, বিলাসবহুল আয়োজনে বিশ্বভ্রমণ ও বিশ্ব দরবারে তাঁর নানা প্রকার ভাঁড়ামো দেশের মান সম্মানও ক্রমাগত ধ্বস্ত করেছে। দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে মোদীর অনভিজ্ঞতা, অজ্ঞতা ও সবজান্তা মানসিকতা যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে হতাশ করেছে। লজ্জায় অধোবদন হয়েছেন অনেকেই। মোদী হয়তো বা সবকিছু উপলব্ধি করেও নিজের চলার পথেই অবিচল থেকেছেন। উপেক্ষা করেছেন দেশ বিদেশের বহু সংখ্যক মানুষের যথার্থ মন্তব্যগুলি। তিনি অকাতরে নস্যাৎ করেছেন যে কোনও বিরুদ্ধ মতামতকে। ন্যূনতম সহনশীলতা এবং পরমত শুনতে চরম অনাগ্রহ থাকলে যা হয়, তাই হয়ে চলেছে।

তাছাড়া, ভারতের মতো অনন্য বৈচিত্র্যসম্পন্ন একটি দেশের ব্যাপ্তি অনুভব করার মতো শিক্ষাও তিনি অর্জন করতে অক্ষম ছিলেন। নাগপুরের রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের পাঠশালা ব্যতীত যাঁর কোনও শিক্ষালাভের সুযোগ নেই তিনি অবশ্যই চোখ থাকতেও অন্ধ। বিশেষ করে, দেশের অর্বুদপতি দৈত্যাকার কর্পোরেট কোম্পানিগুলির সঙ্গে চরম সাম্প্রদায়িক অপশক্তির মেলবন্ধন নরেন্দ্র মোদীকে আরও বেশি বেশি করে নেতিবাচক আত্মপ্রত্যয় গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে। তিনি ধরেই নিয়েছেন যে, গুজরাত রাজ্যে তাঁর একান্ত অনুগত বয়স্য আরেক উগ্র আর এস এস কর্মী অমিত শাহ'র সমভিব্যবহারে যেভাবে সমস্ত ধরনের বিরোধী মতামতকে নস্যাৎ করে শাসন প্রক্রিয়া চালিয়েছেন একইভাবে ভারতের মতো একটি বিশাল দেশের শাসন প্রক্রিয়াও বলবৎ করা যায়।

আন্তঃসারশূন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বহিরাবরণে যেমনই থাকুক প্রকৃত বিচারে তা আর গণতান্ত্রিক থাকতে পারে না। ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্রকে সেভাবে দেখাই সঙ্গত। স্বৈরতান্ত্রিক বা ফ্যাসিবাদী কিংবা ফ্যাসিবাদী প্রবণতা সম্পন্ন শাসন বর্তমানে চলছে, তা নিয়ে কূটতর্ক চলতেই পারে! কিন্তু ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, অন্যান্য বহুবিধ সমালোচনায় বিদ্ধ অপূর্ণতা থাকুক, মূল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এভাবে কোন সময়েই বিধ্বস্ত হয় নি। দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে এই সরল সত্যটি বোধগম্য ভাষায় তুলে ধরা বর্তমান সময়ের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিগুলির একান্ত ও একমাত্র কর্তব্য বলেই বোধ হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না যে, ক্রমাগত ষড়যন্ত্র নির্ভর শাসনপ্রণালী শুধুমাত্র মোদীর একক প্রচেষ্টা নয়। বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একদা গর্ভগৃহ পশ্চিমবঙ্গেও একই প্রক্রিয়ায় শাসনব্যবস্থা দীর্ঘ এক দশকেরও বেশিকাল জুড়ে চলছে। এখানেও একক কর্তৃত্বপ্রিয় এক মহিলা তাঁর সর্বধরনের অপরাধ থাকলেও বহিরাবরণে প্রবল গণতান্ত্রিক ভাব দেখিয়ে স্বৈরতন্ত্রের কুৎসিত বিকাশ ঘটিয়ে চলেছেন। বিরোধীশূন্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়াই তাঁর বিশেষ পছন্দ। এই রাজ্যে উন্নত মননশীল রাজনৈতিক অধ্যায়গুলি দ্রুত অপসৃত হয়ে পড়েছে। সবই হচ্ছে গণতন্ত্রের নামে সুউচ্চ জয়ধ্বনির মাধ্যমে।

বস্তুত দুই শাসকের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও পার্থক্যই নেই। এদের একজন প্রত্যক্ষভাবে নাগপুরে দীক্ষিত এবং অপরজন পরোক্ষে। উভয়েই সাম্প্রদায়িক বোধকে অবলীলায় ব্যবহার করে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে উদগ্রীব। বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্যই এদের কর্ণপটাহ অতিক্রম করতে পারে না। উভয়েই বিরোধিতাশূন্য কর্মকাণ্ডে নির্ভরশীল। ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি সুউজ্জ্বল করে এবং অগণিত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারঙ্গম। নরেন্দ্র মোদী যেমন গলিত পুঁজিবাদের প্রধান পাহারাদার পশ্চিমবঙ্গের নেত্রীও ঠিক তাই। কোনও প্রভেদ নাই।

এই চরম বা জনস্বার্থ বিরোধী শাসনতন্ত্র পরিচালনায় কোন কোন পণ্ডিত বা সমাজতত্ত্ববিদ জনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ হিসেবে দেখাতে চান। জনমনোরঞ্জক চটকদারিপূর্ণ সরকারি বিজ্ঞাপনকেন্দ্রিক আয়োজনগুলিকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব সাধারণে বিভ্রান্তির বিস্তার ঘটিয়ে আপন ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার ছল ভিন্ন কিছুই নয়। কোনও অধিকার নিশ্চিত না করে শুধুমাত্র দানদক্ষিণার ওপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নির্ভরশীল করে রাখার অপকর্ম পশ্চিমবঙ্গে লাগাতার চলছে। মোদী সরকারও সে পথেই চলছে। অতএব সেই সরকারও জনবাদী কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়!

এমন আলোচনা বিস্তারিত করা এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। একান্তভাবেই সদ্য সমাপ্ত ভারতীয় সংসদের শীতকালীন অধিবেশন সম্পর্কিত কিছু অভিজ্ঞতার বিবরণ। এই অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল গত বর্ষাকালীন অধিবেশনে সংসদীয় রীতির বিরুদ্ধতা করে রাজ্যসভায় অশোভনীয় আচরণের অভিযোগে ১২ জন সাংসদকে পুরো অধিবেশনকালের জন্য বরখাস্ত করার অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথ্যা ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু। শুধুমাত্র বিরোধী সাংসদদের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে রাজ্যসভায় সরকার পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে বিভিন্ন বিল পাশ করিয়ে নেবার ফন্দি ছাড়া অন্য কিছুই নয় এই সাসপেনশন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাথমিক রীতি অনুযায়ী যে কোনও শাস্তি বিধানে অপরাধীকে অবশ্যই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এক্ষেত্রে কোনও সাধারণ অপরাধী নয়, দেশের সর্বোচ্চ আইন সভার অন্যতম আইন প্রণয়নকারী সাংসদবৃন্দ। তাঁদের ক্ষেত্রে যদি কোনও গর্হিত অপরাধও হয়ে থাকে তার একতরফা বিচার শুধু অগণতান্ত্রিকই নয়, অমানবিকও। সভ্যতার প্রাথমিক শর্তও লঙ্ঘন করেছে বেঙ্কাইয়া নাইডু বা মোদী সরকারের এমন সিদ্ধান্ত।

দলমত নির্বিশেষে সাংসদরা এ ধরনের সংসদের রীতিবহির্ভূত আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিদিন সংসদ চত্বরের গান্ধিমূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পথে চলা মোদী সরকারের অভিসন্ধির কোনও পরিবর্তনই হয়নি। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার নির্লজ্জ আচরণের পরেও মোদী সরকার নিজেই সংসদের অধিবেশন ভণ্ডুল করে দিল।

২৯ নভেম্বর শুরু হওয়া শীতকালীন অধিবেশন শেষ হবার কথা ছিল ২৩ ডিসেম্বর। তার আগেই অনির্দিষ্টকালের জন্য সংসদ মুলতবি করে দেওয়া হল। আলোচনা এবং বিতর্ক ছাড়াই বিল পাস করানোটা বর্তমান সরকারের স্থায়ী রেওয়াজে পরিণত করেছে মোদী সরকার। বিরোধী পক্ষ এই অধিবেশনে দেশে পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, চরম বেকারত্ব সমস্যা, লখিমপুর খেরিতে পরিকল্পিত পথে কৃষক হত্যা প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা দাবি করলেও লোকসভার স্পীকার কিংবা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান কোনও দাবিই মানেন নি। সংসদকে শুধুমাত্র সরকারের আজ্ঞাবহ হিসেবে জোর করে ব্যবহারের ব্যবস্থা করে ফেলেছে বর্তমান সরকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিছক প্রহসনে পরিণত করেছে আর এস এস নির্দেশিত ভারতীয় জনতা পার্টি।

শীতকালীন অধিবেশনের নামে ডামাডোল তৈরি করে নির্বাচন পদ্ধতিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি আইন গায়ের জোরে পাস করিয়ে নিয়েছে সরকার। লোকসভায় নির্ধারিত ৮৩ ঘণ্টার অধিবেশনে ৪৮ ঘণ্টাই সঙ্গত বিক্ষোভের ফলে নষ্ট হয়েছে। এসবের মধ্যেই রাজ্যসভায় একটি বিল ও লোকসভায় ১২টি বিল সহ মোট ১৩টি বিল বিনা আলোচনায় পাস করিয়ে নিল সরকার। মাত্র ছ'টি বিল পেশ হবার পর স্থায়ী কমিটিতে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। সংসদ চালু রাখার যে দায়িত্ব সরকারকে বহন করতে হয় তা, সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

দেশের সরকারই চাইছে না সংসদ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হোক। উভয় কক্ষের পরিচালন ব্যবস্থা সংসদীয় রীতি অনুযায়ী চালানোর দায়িত্ব যে দুই ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত তাঁরা পূর্ণত ব্যর্থ হয়েছেন। বস্তুত সংসদীয় রীতি অনুসারে লোকসভার স্পীকার বা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান কোনও দলের পক্ষাবলম্বী হতে পারেন না। সংকীর্ণ দলীয় মতের উর্ধে উঠেই তাঁদের সভা পরিচালনায় নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই সময়ে তার বিপরীত পথেই চলেছেন এইসব তথাকথিত মাননীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বয়। তাঁরাও মোদী-শাহ'র নির্দেশ অনুযায়ী গণতন্ত্রের ধ্বংস সাধনের কুশীলবে পরিণত। এর চাইতে নক্কারজনক কোনও কিছুই হতে পারে না।

এমন সবকিছুর পিছনে সংশয় হয় যে, নয়া উদারনীতি প্রচলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মতাদর্শ নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিদের সম্পর্কে জনমানসে একটি খেলো বা অশ্রদ্ধামূলক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে যেভাবে সরকার, কি কেন্দ্রে বা রাজ্যে চলছে এবং তাদের পোষিত সংবাদমাধ্যমগুলি যে সব প্রসঙ্গে সোচ্চার রয়েছে তাতে রাজনীতি সম্পর্কেই মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ নির্মিত হয়ে পড়েছে। ভাল মন্দের মধ্যে কোনও পার্থক্যই আর করা যাচ্ছে না। এমন ভাবনা কি পূর্ণত অমূলক যে বর্তমান সরকারগুলি আর পুরনো পদ্ধতিতে প্রশাসন চালাতে চাইছে না।

মুসলিম মহিলাদের ছবি দিয়ে আবার নিলামে

অনুমতি ছাড়া ছবি ব্যবহার করে অ্যাপের মাধ্যমে নিলামের জন্য তালিকাভুক্ত করা হলো শত শত মুসলিম মহিলার নাম। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়বারের জন্য এ ধরনের ঘটনা ঘটলো।

অনলাইনে নিলাম হচ্ছে এই মেয়েদের। শুধু 'মেয়েদের' বললে ভুল হয়, বলতে হয় মুসলিম মেয়েদের। সম্প্রতি এমন এক অভিযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে দিল্লি পুলিশ, শুরু হয়েছে তদন্ত। সাংবাদিক ইসমাত আরার লিখিত অভিযোগের মধ্য দিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। অন্তত ১০০ জন মহিলার ছবি এই নিলামে উঠেছে বলে দাবি অভিযোগকারিণীর। মহারাষ্ট্রের শিবসেনা দলের মন্ত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদীও মুখ খুলেছেন গোটা বিষয়টিতে। কেন্দ্রের যে এই ভয়ঙ্কর বিষয়টির প্রতি কোনো দৃষ্টি নেই সেদিকে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

যে অ্যাপে এই কাজ চলছে তার নাম 'বুল্লি বাই'। গতবছরের ঠিক এমনই একটি সময়ে অভিযোগ উঠেছিল অন্য একটি অ্যাপ-এর বিরুদ্ধে, সেই অ্যাপটির নাম ছিল "সুল্লি ডিলস"। দক্ষিণপন্থীরা মুসলিম মহিলাদের নিয়ে ঠাট্টা করার সময় সুল্লি, বুল্লি শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। এই শব্দগুলি অত্যন্ত অবমাননাকর। তবু তা ব্যবহার করেই অ্যাপে লেখা হয়েছিল ডিলস অফ দ্য ডে। এক বছরের কম সময়ের মধ্যে সেই একই অভিযোগ এল। এখনও এই দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করা হয়নি। এমন নোংরা কাজ করার পিছনে তাদের অভিপ্রায় বা কি?

সরব, সোচ্চার মুসলিম মহিলাদেরই ওরা টার্গেট করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদ এর বিরুদ্ধে যারা যারা সোচ্চার তাদেরই ওরা নিলামে চড়িয়েছে। আসলে এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম নারীদের ছোট করা, অপমান করা, অপদস্ত করা। হানা খান (পাইলট) নিজ আমিন, ইসমাত আরার মত বিশিষ্ট মহিলাদের অতি কুৎসিতভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। ভারতের নতুন নাগরিকত্ব আইন-এর বিরুদ্ধে যারা আন্দোলনে সোচ্চার ছিলেন তাদেরও এই অ্যাপের মাধ্যমে অবমাননা করা হয়েছে। পুলিশ যদিও জানিয়েছে যে তারা তদন্ত শুরু করেছে কিন্তু অ্যাপ তৈরির পেছনে কারা তা নিয়ে এখনো প্রশাসন মুখ খোলেনি।

এই অ্যাপটি যারা অনলাইনে দিয়েছে বা আপলোড করেছে তারা নকল নাম পরিচয় ব্যবহার করেছে। এই অ্যাপে যে মুসলিম নারীদের নাম ও ছবি তালিকায় তোলা হয়েছে তারা সবাই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার। এই ধরনের আক্রান্ত ১২ জন। মহিলারা মিলে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপও খুলেছেন এই অন্যায়ের প্রতিবাদে। আমরা আরো জানি, তাঁরা একই রকম সোচ্চার হিন্দুত্ববাদের স্বঘোষিত ধর্মগুরু নরসিংহানন্দের বিরুদ্ধে। এই লোকটি হরিদ্বারের ধর্ম সংসদে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চরম হিংসাত্মক মন্তব্য করেন। এদের বিরুদ্ধে এই মুসলিম মহিলারা ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদে সোচ্চার। তাই তারা এ ধরনের অসম্মানের শিকার। কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী শনিবার গভীর রাতে একটি টুইট করে জানান ওই অ্যাপ ব্লক করা হয়েছে। কিন্তু ব্লক করাই কি যথেষ্ট? যে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মদতে এসব কাজ ঘটছে, যারা প্রকাশ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হত্যা করার হুমকি দিচ্ছে তাদের কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না? কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনে সামিল হলেই তাকে দেশদ্রোহী বলে বছরের পর বছর জেলে আটক রাখা হয় অথচ মহিলাদের (সে হিন্দু-মুসলিম, খ্রিস্টান যাইহোক) এভাবে অপমান করা হবে, সেখানে বিচারের বাণী কি শুধুই নীরবে নিভৃতে কাঁদবে?

নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘ সহ আরও পাঁচটি মহিলা সংগঠন-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দিয়ে যে দাবি মহিলা সংগঠনগুলো তুলছে তা হল—এই অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। পূর্বেও এ ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে দিল্লি ও উত্তরপ্রদেশে শুধু এফ আই আর করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কাউকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এ অবস্থার প্রতিকার জরুরি। দেশজুড়ে ঘৃণা—ভাষণ, শারীরিক আক্রমণ, সংখ্যালঘুদের স্বাভাবিক জীবনে প্রবল বাধা চলেছে। কিন্তু সংখ্যালঘুর কারণে এদের নিপীড়ন বিষয়ে পুলিশ, প্রশাসন এমনকি, বিচারব্যবস্থাও নীরব। ফলস্বরূপ এই ধরনের হিংসা, অসভ্যতা, নোংরামি প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। আর তাই বছর শুরু না হতে হতেই 'বুল্লি বাইয়ের' মতো ঘটনার সাক্ষী হতে হল মানুষকে। এমনকি, জে এন ইউ'র নিখোঁজ ছাত্র নাজিব আহমেদ-এর মা ফতিমা আহমেদকেও নিলামে চড়ানো হয়, তিনিও রেহাই পাননি। এ কোন দেশে আমরা বাস করছি? একথা সহজেই বোঝা যায়, এগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় খুব পরিকল্পনামাফিকই রাষ্ট্রীয় মদতে এ ঘটনা ঘটছে। সারা দেশজুড়ে মহিলাদের উপর নির্যাতন বেড়েই চলেছে। সেখানে মুসলিম মহিলাদের উপর এই নিলামে চড়ানোর মতো নোংরা কাজ বন্ধ না হলে তা যে সমস্ত মহিলাদের ওপর আক্রমণকারী দুষ্কৃতীদের হাতই শক্ত করবে এ কথা বলাই বাহুল্য।

একটি বিশেষ ধর্মের মেয়েদের ইজ্জত আব্রু নষ্ট করতেই এই ভার্চুয়াল হাট (নিলামকেন্দ্র) শুধু নয়। শুধুমাত্র যৌন বিনোদনের কারণেই এটা ঘটছে তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর পেছনে রয়েছে ভিন্ন ধর্মীয় নারীদের ভার্চুয়াল মাধ্যমে যৌনগন্ধী আক্রমণ করে ধর্ম রক্ষা করার সঙ্ঘী মানসিকতা। দেশে মূল্যবৃদ্ধি যখন চরমে, যুবসমাজ বেকারত্বের জ্বালায় জেরবার, মানুষ মহামারির কারণে প্রতিনিয়ত কাজ হারাচ্ছে আর দু মুঠো খাবার জোগাড় করতে গিয়ে জেরবার হচ্ছে ঠিক তখনই এ ধরনের ইস্যু তৈরি করে নজর ঘুরিয়ে বিভ্রান্তি করতেই এধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে।

মাইক্রোসফট-এর মালিকানাধীন সফটওয়্যার গিটহ্যাবের মাধ্যমে 'সুল্লি ডিলস' এক বছর আগে তৈরি হয়েছিল। 'বুল্লি বাই' অ্যাপটিও গিটহাবের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। শতাধিক বিশিষ্ট মহিলার নাম আপলোড হয়েছে এই অ্যাপে। যদিও আশার কথা, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ধ্বনিত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বর্তমানে আমাদের দেশে রাজনৈতিক জটিল মেরুকরণ হওয়ার কারণেই মুসলিম নারীদের বিরুদ্ধে ট্রোলিং পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নিয়েছে। ওরা চাইছে যারাই হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হিন্দু-মুসলিম যাই হোক, তাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিতে। কিন্তু আশার কথা এই যে, শাহীনবাগে যে মুসলিম মহিলারা ঘর ছেড়ে একজোট হয়ে ধরণায় বসেছিলেন তাঁদের শক্তিকে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ভয় পেয়েছে।

উগ্র ধর্মান্ধ বর্বরতার প্রশ্রয়দাতা স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকার। তারা কখনোই হিন্দুত্ববাদীদের কদর্য কাজকর্মের বিরুদ্ধে যাবে না। বিগত সাত বছরের অভিজ্ঞতা তা-ই। সুতরাং এইসব অপকর্মের প্রতিবাদকে মোদী-শাহ সরকারের বিরুদ্ধে চালিত করা সর্বাধিক জরুরি এবং সেই কর্মসূচি সঠিকভাবে পালন করতে বামপন্থী দলগুলিকেও ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রসঙ্গটি শুধু কিছু সংখ্যক নপুংসকের বিকৃত উল্লাসের নয়, এ আদ্যন্ত রাজনৈতিক। রাজনৈতিক ভাবেই এমন ক্লীবতার যথাযোগ্য জবাব দিতে হবে।

বিজেপি'র আইটি সেল ক্রমাগত ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওরা হিন্দু মহিলাদেরও শুধুমাত্র গর্ভধারণ এবং গৃহাভ্যন্তরের সর্ববিধ কাজে আবদ্ধ রাখতেই উদগ্রীব। অন্য ধর্মের মহিলাদের আক্রমণ করে যারা এক ধরনের বিকৃত উল্লাসে মেতে উঠছে তাদের মনে করিয়ে দিতে হয়,

কিন্তু যাদের তারা ভয় দেখাচ্ছে তারা কিন্তু জানে...

"যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায়
ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে
তাহার তখনই সে,
পথ কুক্কুরের মত সংকোচে
সত্রাসে যাবে মিশে।
এই অন্ধকার সময়ে
এটাই আশার আলো।

—সর্বানী ভট্টাচার্য

রাজ্য সরকার শিক্ষাঙ্গনে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করছে —পি এস ইউ

করোনা অতিমারির তৃতীয় ওয়েভের মুখোমুখি আমাদের রাজ্য। একদিকে যেমন সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত, অন্যদিকে রাজ্য সরকার করোনার অজুহাতকে ব্যবহার করে তার কর্পোরেট দরদি দৃষ্টিভঙ্গীকে বাস্তবায়িত করতে অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে সামান্য কিছু বিধিনিষেধ জারি করলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার বিষয় ঘোষণা করেছে। দীর্ঘ দুই বছরের কাছাকাছি সময়ে করোনা পরিস্থিতিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচাতে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল তা করার কোনো আগ্রহ দেখায় নি। আসলে ওরা শিক্ষার উপর কোনও দায়ভার গ্রহণ করতেই চায় না। কর্পোরেট নির্দেশিত শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের উদ্দেশে সমস্ত পরিকল্পনা। আমরা পি এস ইউ'র পক্ষে বারে বারে সরকারকে বলে আসছি যে, দেশের আশি শতাংশ সাধারণ মানুষের করোনায় জীবন জীবিকা বিপর্যস্ত, দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষের সাথে স্মার্ট ফোন, ইন্টারনেটের কোনো সম্পর্ক নেই। তার সাথে যুক্ত ক্রমাগত ইন্টারনেটের খরচ বৃদ্ধি। এই দেশে অনলাইন ক্লাসের মধ্য দিয়ে পঠন পাঠন কখনও সম্ভব নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বসে পঠন-পাঠনের কোনো বিকল্প হতে পারে না। অবিলম্বে সমস্ত কোভিড বিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা খুলতে হবে প্রত্যক্ষ পঠনপাঠনের উদ্দেশে। একটা প্রজন্মকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের আবেদন ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সংগঠন সহ সংশ্লিষ্ট সব মহলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আংশিকভাবে হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খোলার বিকল্প পথ বের করতে হবে, সেই সাথে বিশেষ প্রয়োজনীয় অনলাইন ক্লাসের জন্য সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সকলকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট পরিষেবা সহ স্মার্ট ফোনের ব্যবস্থা সরকারকে দিতে হবে।

পি এস ইউ নেতৃত্বের বিবৃতি :—

শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে একটি সরকারের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হয়। করোনা অতিমারিকে হাতিয়ার করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার নীতি তাদের কর্পোরেট দরদি চরিত্রকেই সামনে নিয়ে এসেছে। গতকাল আমাদের রাজ্য সরকার কোভিড অতিমারীর তৃতীয় ঢেউ নিয়ন্ত্রণে বিধিনিষেধ জারি করেছে। আমাদের আশঙ্কা মতোই কোপ পড়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার অধিকারে। কিছু বিধিনিষেধ মেনে সিনেমা হল, রেস্তোরাঁ, পানশালা সহ শপিং মল খোলা রাখা যাবে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পঠন-পাঠন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।

রাজ্যের বর্তমান সরকার গত ২০২০ সালের মার্চ থেকে লকডাউনের অজুহাতে দীর্ঘ দেড় বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছিল। পি এস ইউ সহ বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক- শিক্ষাকর্মী সহ অভিভাবকদের লাগাতার আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি নভেম্বর মাসে আংশিক ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে বাধ্য হয়েছিল রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলবার যে কোন সদিচ্ছা ছিল না তা, গতকালের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার ফলে ড্রপ-আউটের সংখ্যা বাড়ছিল, ফলে এই সিদ্ধান্ত ড্রপ আউটের সংখ্যা আরও বাড়তে সাহায্য করবে। অনলাইন ক্লাসে রাজ্যের বিশাল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাগ্রহণ করতে পারছে না। ডিজিটাল বৈষম্যের মাধ্যমে রাজ্যের গরিব, নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, বাড়ছে মানের বৈষম্য। মিড-ডে মিলে ব্যয় কমিয়ে হাজার হাজার শিশুকে খাদ্যের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার বিনোদন ও চটুল সংস্কৃতির আবহে রাজ্যের মানুষকে মোহগ্রস্ত করতে চায়। শিক্ষার অধিকারকে এরা ভয় পায়। অনলাইন ক্লাসকে স্থায়ীরূপ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিকেই রাজ্য সরকার বাস্তবায়িত করতে চাইছে।

আমরা পি এস ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি মনে করি যদি পঞ্চাশ শতাংশ দর্শক নিয়ে সিনেমা হল চলতে পারে তাহলে কেন শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোভিড বিধি নিশ্চিত করে বিভিন্ন শ্রেণির পর্যায়ক্রমে সপ্তাহে অন্তত দু-তিন দিন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাবে না। গত দুই বছর ধরে পরিকাঠামো না গড়ে, শিক্ষক নিয়োগ না করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানা সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে পরিণত করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার বিকল্প অনলাইন ক্লাস হতে পারে না। রাজ্যের সমস্ত এলাকাতে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট পরিষেবার সুবিধা যেমন একদিকে নেই, অন্যদিকে করোনার কারণে জীবন জীবিকা হারানো বিপর্যস্ত পরিবারের সন্তানরা কিভাবে ক্রমবর্ধমান ইন্টারনেট খরচ জোগাড় করে অনলাইন ক্লাস করবে তা অনিশ্চয়তায়। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে বেসরকারিকরণের পথ মসৃণ করাই সরকারের লক্ষ্য। করোনা অতিমারিতে আমজনতার সর্বনাশের সুযোগ কর্পোরেট দরদি সরকারগুলি একের পর এক জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করে চলেছে। আমাদের রাজ্য সরকারও তার ব্যতিক্রম নয়। সংবিধানপ্রদত্ত শিক্ষার অধিকার ও শিশু শিক্ষার অধিকার আইন সরকার লঙ্ঘন করছে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সহ একটা প্রজন্মকে ধ্বংস করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। সেই সাথে বৈষম্যমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে পি এস ইউ রাজ্য কমিটি আহ্বান জানাচ্ছে।

কৌশিক ভৌমিক
সভাপতি

নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা
সম্পাদক

পঞ্চাশ বছর পরে ফিরে দেখা

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

(দি কল, ডিসেম্বর ১৯৭১)

অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারত-পাক যুদ্ধে পাকিস্তান ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তাক্ত ইতিহাস সামরিক ফ্যাসিবাদী পাকিস্তানের শাসনের পরাজয়ের উপরে রচিত হল। মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক শক্তিরূপে এবং পাকিস্তানের অতর্কিত বিমান হামলার প্রতিরোধে সেদিনের যুদ্ধকে আর এস পি ন্যায়যুদ্ধ হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছিল। ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর কিছুদিন বাদেই 'দি কলের' ডিসেম্বর সংখ্যার মূল্যবান সম্পাদকীয়তে যুদ্ধকালীন সময়ে আর এস পি'র দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছিল। সেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করা হল। **—সম্পাদকমণ্ডলী, গণবার্তা**

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে সেই যুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের সহায়তায় ভারত এগিয়ে আসায় প্রতিহিংসাপরায়ণ পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের প্রতিবাদ ভারত সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার ঘটনাগুলি দ্রুত ঘটে চলেছে। আশা করা গিয়েছিল এরকমই ঘটবে। আর এস পি ও ইতিপূর্বে অনেকের সঙ্গেই একমত হয়ে বলেছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া ভারতের কাছে আর অন্য কোন বিকল্প নেই।

ঠিক এই কারণেই গত নভেম্বরের 'দি কলের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা লিখেছিলাম : "যুদ্ধ : কার যুদ্ধ এবং কোন যুদ্ধ?" ঐ প্রবন্ধে দলের তরফ থেকে একটি সাধারণ গাইডলাইন উপস্থাপিত হয়েছিল। পাকিস্তানের সামরিক-ফ্যাসিবাদী বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে উগ্র প্রতিশোধস্পৃহায় তাড়িত হয়ে যুদ্ধে নেমেছে। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। গত নভেম্বরের দি কলের সম্পাদকীয়তে আমরা লিখেছিলাম :

"আর এস পি অবিলম্বে ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে দুনিয়ার বৃহৎ শক্তিগুলির দরজায় দরজায় না ঘুরে সরাসরি বাংলাদেশের প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান করুক। শ্রীমতী গান্ধী এখনও ইউরোপ আমেরিকার ভূমিকার জন্য দ্বিধাগ্রস্ত। আর এস পি এই মুহূর্ত থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকামী মানুষদের অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি করছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য এটাই এখন মুক্তিকামী মানুষের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। বাংলাদেশের কূটনৈতিক স্বীকৃতির বাহানায় পাকিস্তান যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় এবং ভারত বাধ্য হয়েই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে, তবে নিঃসন্দেহে প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে স্বাগত জানাবে।"

সম্পাদকীয়তে সেদিন স্পষ্টভাবে একথাও বলা হয়েছিল যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের এই যুদ্ধ অবশ্যই তিনটি ভিন্ন ধরনের যুদ্ধের সমাপতন। প্রথম, পাকিস্তানের ২২টি শয়তান একচেটিয়া ভূস্বামী পরিবারের পোষিত সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের দাবির কারণে এই যুদ্ধ অবশ্যই ন্যায় যুদ্ধ। আর এস পি সর্বান্তকরণে এই ন্যায়যুদ্ধের পক্ষে।

দ্বিতীয়, এই যুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জুন্তা ভারতের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই পাকিস্তানের এই প্রতিহিংসা মূলক আচরণ। সুতরাং ভারতের সার্বভৌমত্ব ও প্রতিরক্ষার কারণেই আর এস পি এই যুদ্ধকে সমর্থন করে।

কিন্তু মার্কসবাদী দল আর এস পি মনে করে আর একটি তৃতীয় যুদ্ধ এক্ষেত্রে উপস্থিত হচ্ছে। ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ভারতের এই আত্মরক্ষার যুদ্ধকে ঈশ্বরপ্রেরিত সুযোগ হিসেবে দেশে অদুর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বাজার দখল। কালোবাজারির পরিসর বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে দুটি দেশের জনগণের বিরুদ্ধে এবং তৃতীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অর্থাৎ ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগ্রামকে এরা মুনাফার নিরিখে দেখার জন্য লালায়িত। এজন্যই নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে এই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে এরা উৎসাহী। পুঁজিপতি শ্রেণি এবং শাসক আমলাতন্ত্রের পোষিত গোষ্ঠীরা বর্তমান যুদ্ধকে পুঁজিবাদী যুদ্ধে পরিণত করবে। নির্দ্বিধায় আর এস পি এই অসাধু প্রচেষ্টাকে অর্থাৎ যুদ্ধের সুযোগে ভারত ও মুক্তিকামী বাংলাদেশের মানুষকে শোষণের যুদ্ধ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমে উগ্র দেশাত্মবোধমূলক প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি দুটি দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরবে।

ইতিমধ্যে অনেক আবশ্যক জিনিসপত্র বাজার থেকে উধাও। একচেটিয়া পুঁজিপতি এবং একশ্রেণির আমলারা যুদ্ধ সামগ্রীর ব্যবসার জন্য অর্ডার দিচ্ছে এবং দর হাঁকাচ্ছে। তাই আর এস পি এই যুদ্ধের পুঁজিবাদী উপাদানগুলির বিরুদ্ধে দু'দেশের মানুষের কাছে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানাচ্ছে।

প্রধানত এই তিনটি গাইডলাইন অনুসরণ করেই আর এস পি তাদের দলীয় কর্মীদের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশ দেবে।

ইতিমধ্যে এই সম্পাদকীয়টি ছেপে প্রকাশিত হওয়ার মধ্যেই সম্ভবত বিভিন্ন ফ্রন্টে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সৈন্যদের যৌথ যুদ্ধে দখলদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পরাজিত হবে। অবশ্যই যদি না আমেরিকা এবং চিন সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়।

মনে করার কোন কারণ নেই এখানেই বাংলাদেশ যুদ্ধে পরিসমাপ্তি ঘটবে। জাতিসংঘ পাকিস্তানের বন্ধুরা যথা আমেরিকা, চিন সহ তুর্কী, ইরান, সৌদি আরবীয়া প্রভৃতি পাকিস্তানের পক্ষে এগিয়ে এসে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে না। অথবা এই যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই অনেকে পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে নামবে। অনেকদিন ধরেই আমেরিকা সহ কয়েকটি সুপার পাওয়ার চায় না দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতের শক্তিবৃদ্ধি হোক। তাই সর্বদাই এরা পাকিস্তানকে সামরিক ও অন্যান্য ধরনের সহায়তা দিয়ে ভারতকে চাপে রাখতে চায়। সুতরাং বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পাকিস্তান আরও দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলেই এরা শঙ্কিত। তাই এই যুদ্ধে পাকিস্তান যাতে পূর্ব এবং পশ্চিম দুটি ফ্রন্টেই লড়াই চালিয়ে যেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। সংবাদে প্রকাশ ৯০০০০ টন পারমাণবিক অস্ত্র সমন্বিত এন্টারপ্রাইজ নামক যুদ্ধজাহাজ সহ অসংখ্য ধ্বংসাত্মক ডেস্ট্রয়ার ও জাহাজ ভিয়েতনাম থেকে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে রওনা হয়েছে। জাপান, আমেরিকা এবং অন্য কয়েকটি দেশ ভারতকে কোন রকম আর্থিক সহায়তা বন্ধের হুমকি দিয়েছে।

উপরোক্ত পরিস্থিতির বিচারে আর এস পি নির্দ্বিধায় ভারতের প্রতিরক্ষা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতির লক্ষ্যে এই যুদ্ধকে পূর্ণ ন্যায়ের যুদ্ধ রূপে সমর্থন করছে। পাশাপাশি ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির এই যুদ্ধকে সাধারণ মানুষের শোষণের লক্ষ্যে পরিচালিত করার প্রচেষ্টাকে বিরোধিতা করছে।

এই যুদ্ধকে ভিন্ন শর্তে সমর্থনের উদ্দেশ্যে আর এস পি সুস্পষ্টভাবে এই বার্তা ঘোষণা করছে—

(১) ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং খেটেখাওয়া মানুষের ক্ষমতা অর্জনের নিরিখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত অর্থ ব্যাপক রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যমে দু'দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে।

(২) ভারতের প্রতিরক্ষা যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ তথা মানবসভ্যতাবিনাশী কার্যকলাপের মুখোশ খুলে দিতে হবে।

(৩) স্বার্থান্ধ পুঁজিপতিদের কালোবাজারি এবং মুনাফালুণ্ঠনের স্বার্থে যুদ্ধকে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(৪) শাসক কংগ্রেসের উদ্যোগে জরুরী অবস্থার সুযোগে দুষ্কৃতিকারী অসাধু ব্যবসায়ী এবং দেশদ্রোহীদের ছাড় দিয়ে গণআন্দোলনের কর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠনের প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে রুখতে হবে।

(৫) স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হলে সে দেসের বাম ও গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির পাশে সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়াতে হবে ও দেশের খেটে খাওয়া মানুষের নবার্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং প্রসারের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে যথাসাধ্য সহায়তা করতে হবে। সর্বদা সচেতন থাকতে হবে যে স্বাধীন বাংলাদেশের ওপর যেন ভবিষ্যতে প্রতিক্রিয়াশীল থাবা না বসাতে পারে।

দেশের রাজনীতি এবং অর্থনীতির ওপর যেন খেটেখাওয়া মানুষের অধিকার অর্জিত হয়।

এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিল এবং জেনেরাল এ্যাসেম্বলী যেভাবে দেখছে তাতে মনে হয় বাংলাদেশের মানুষকে আরো রক্তাক্ত পথের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। ভারতবাসীও এই রক্তাক্ত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের সাথী। আমাদের দেশে নিজেদের ও খেটেখাওয়া মানুষের শক্তিকে যথাসম্ভব সংহত করতে হবে। দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে হবে যে, শেষ যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হবই হবো।

লক ডাউনে 'কুনাট্য' এবং শ্রমজীবী মানুষ

সৌম্য শাহীন

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে
মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়"

গত সাতদিন ধরে এই বঙ্গভূমিতে অনুষ্ঠিত হলো এক অলীক কুনাট্য রঙ্গ। উৎসবের মরশুমে শীতের আমেজে গা সেঁকে নিতে রাস্তায় নামলো মানুষের ঢল। অতিমারির আতঙ্ককে তোয়াক্কা না করে পার্ক স্ট্রিট, ইকো পার্ক সহ শহরের জমজমাট কেন্দ্রগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় জমালেন। পাঁচতারা হোটেল, ক্লাব থেকে শুরু করে পাড়ার মোড়ে মোড়ে, পুরভোটের বিজয় মিছিলে, পিকনিক পার্টির হুল্লোড়ে, এক ধাক্কায় কমে যাওয়া মদের দামে জমে উঠেছিল বছর শেষের পার্টি। অনুপ্রেরণা দিতে রাজ্য সরকার চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি, জনসমাগমের ওপর থেকে সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নিয়ে, এক ধাক্কায় মদের দাম প্রায় তিরিশ শতাংশ কমিয়ে ডিগ ডিগ খেলার আসর জমিয়ে দিলেন মাননীয়া। দুর্গাপুজোর সময়েও একই চিত্র দেখা গিয়েছিল, মন্ত্রী সান্ত্রীদের হাই প্রোফাইল পুজোয় এভাবেই হামলে পড়েছিল আদেখলা ভিড়, যদিও সে যাত্রায় কোন অজ্ঞাত কারণে সংক্রমণের হার তেমন একটা বাড়ে নি। সম্ভবত ভাইরাস তবলীগ জামাতের সম্মেলন বা যীশুপুজোর সময়ে যতটা সক্রিয় হয়ে ওঠে, পুজোয় সে দাপট তার থাকে না! সমস্যা হলো এই আমোদগেঁড়ে মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর বাইরে কোটি কোটি মানুষ এই বঙ্গে বাস করেন, যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। এরা মাঠে, কারখানায় কাজ করে, বাবুদের বাড়ির হেঁশেল ঠেলে, রিকশা বা ভ্যান চালায়, সবজি বেচে, হকারি করে। এদের পুজো, বড়দিন, বর্ষপূর্তির মোচ্ছবে গা ভাসানোর স্বপ্ন দেখাও মানা। কিন্তু বাবুদের আমোদের সব দায় এইসব খেটে খাওয়া মানুষকেই নিতে হয়। উড়োজাহাজে চড়ে অনাবাসী ভারতীয়রা ডলারের সাথে ভিনদেশী সংক্রমণ নিয়ে আসছেন, ন্যূনতম সাবধানতা অবলম্বন না করে যথেচ্ছ ফুর্তি করছেন, অসুস্থ হলে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে মেডিক্লেমের টাকায় চিকিৎসা পাচ্ছেন। অন্যদিকে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা দেখিয়ে সরকার ও পেটোয়া মিডিয়া আতঙ্ক সৃষ্টি করে স্কুল কলেজ লোকাল ট্রেন বন্ধ করে দিচ্ছে। পরিযায়ী শ্রমিকের রক্তে মাখামাখি রেললাইন বা হাইওয়ের ছবি দেখে পার্ক স্ট্রিট, শ্রীভূমিতে ভিড় করা বাঁধা মাইনের বাবু বিবিরা মুচকি হেসে

এর পর ৮ পাতায়

লেনিনের তত্ত্ব ও অনুশীলনের মূল কথা

পূর্ববর্তী সংখ্যার পর

(৬) **সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতির অংশ হিসেবে প্রয়োগ করা।** গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামগ্রিক উপাদানগুলিকে কিভাবে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে উন্নীত করা যায় এ বিষয়ে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি ভীষণ স্বচ্ছ ছিল। আমরা সর্বক্ষেত্রে দেখেছি দলীয় এবং গণসংগঠনের কাঠামোর মধ্যে যেমন গণতান্ত্রিক চেতনাকে লেনিন সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন সেই রকমই গণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পরিসর যত বৃদ্ধি করা যায় ততই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিবাচক উপাদানগুলি যুক্ত হয় বলে মনে করতেন। লেনিন বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎখাতের লক্ষ্যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি দিতে ব্যর্থ সেই সেগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দল এবং শ্রমিকশ্রেণিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে চূড়ান্ত রণনীতি রূপে লক্ষ্য স্থির করে প্রজাতন্ত্র গঠনের দাবি, জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে প্রশাসনের আধিকারিক নির্বাচন এবং নিয়োগের দাবি, বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী তথা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, প্রতিটি দাবিকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণকৌশল রূপে ব্যাখ্যা করতেন এবং শোষিত জনগণসহ দলীয় কর্মীদের কাছে সেই ভাবেই উপস্থাপিত করতেন। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অবক্ষয় প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে শ্রমিকশ্রেণির আধিপত্যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যাওয়ার সময় সমাজ এবং সংস্কৃতিতে গণতন্ত্রের সামগ্রিক এবং বহুমুখী বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

(৭) **শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী প্রসঙ্গে।** রাশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ কৃষি অর্থনীতিভিত্তিক সমাজে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রণনীতির কৌশল হিসেবে তিনি সর্বদাই শ্রমিক- কৃষকের মৈত্রীর উপর ভিত্তি করে গণআন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। লেনিন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগ্রামের সন্ধিক্ষণে দুর্বল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক সচেতনতার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে শোষিত কৃষক এবং কৃষি মজুরদের অপূর্ণ দাবি-দাওয়া এবং অধিকার নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের সংগ্রামে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতাকে তিনি পরবর্তীকালে প্রতিটি সংগ্রামে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে লড়াইকে নিদর্শন রূপে তুলে ধরতেন। আর শোষিত কৃষক সমাজের বৃহত্তর অংশ শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে একত্রে গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রা অনেক মসৃণ হয় বলে মনে করতেন।

(৮) **যুক্তফ্রন্ট করে আন্দোলনের কৌশল।** ১৯০৫ সালের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক গণঅভ্যুত্থানে রাশিয়ার বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, উদারবাদী দল, এমনকি জারের শাসনে অতিষ্ঠ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দলসমূহ একমঞ্চে স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদেই ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে শামিল হয়েছিল। এই রণকৌশলের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রসঙ্গে লেনিনের মতবাদ ছিল প্রতিটি দল তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব এবং নীতি নিয়ে চলতে চলতে আর্থসামাজিক প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে শামিল হতে পারে। বিশেষ সামাজিক সংস্কার এবং অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার, প্রভৃতি দাবিতে যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। শুধু তাই নয় ১৯১৭ সালের সাময়িক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকার শ্রমিক শ্রেণি নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক শোষিত মানুষের সোভিয়েত-এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার লড়াইয়ে ডাক দিয়েও তৎকালীন শাসক শ্রেণির সঙ্গে একত্রে কর্নিলভের সামরিক একাধিপত্যের বিরুদ্ধে খুব অল্প সময়ের জন্য এক ধরনের যুক্তফ্রন্টের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লবীরা। এইসব বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই লেনিনের পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে বিভিন্ন দলকে সঙ্গে নিয়ে চলা এবং একটি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রে আঘাত দেওয়ার রণকৌশল মার্কসবাদ-লেনিনবাদী সংগ্রামে মূল্যবান তত্ত্ব রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

(৯) **পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদের আর্থ রাজনীতি সম্বন্ধে সম্যক চেতনা।**

লেনিন প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে পুঁজিবাদী বিশ্বের গভীরতম সংকট-এর প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক স্বরূপটি তুলে ধরে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামী ভূমিকা কোন রণনীতি নিয়ে চলবে তার একটি মৌলিক বিশ্লেষণ পৃথিবীর মার্কসবাদী দল সংগঠন এবং শ্রমিক শ্রেণির কাছে উপস্থাপিত করেন।

লেনিন যদিও পুঁজিবাদের মৌলিক চরিত্র সম্বন্ধে পণ্য উৎপাদন এবং উদ্বৃত্ত শ্রমের ভূমিকা বিষয়ে মার্ক্স-এঙ্গেলস এর বিশ্লেষণ থেকে একবিন্দুও সরে আসেননি, তবুও তাঁর ব্যাখ্যা, পুঁজিবাদের সর্বাধুনিক স্তরে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের পরিসরে যেন পণ্য উৎপাদন অস্পষ্ট হয়ে অতিরিক্ত মুনাফার তাগিদে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অনেক বেশি বেশি করে লগ্নিপুঁজি বা আর্থিক পুঁজি নির্ভর হয়ে পড়ছে। আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যাখ্যাটি লেনিন প্রায় একশ বছর আগেই সমাজ বিপ্লবের প্রেক্ষিতে বিপ্লবী দল ও ব্যক্তিদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র জাতীয় স্তরে পুঁজিবাদকে সর্বস্তরে আইন প্রশাসন এবং সামরিক তথা পুলিশি সহায়তা দিয়ে পুঁজিবাদের একচেটিয়া স্তরে উপনীত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। একটা সময়ে এসে যখন এই অতিরিক্ত পুঞ্জিভূত পুঁজি আন্তর্জাতিক পুঁজির অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হয়ে পড়ে তখন আমদানি রপ্তানির অর্থনীতি এবং উপনিবেশিক শাসনের পুরানো ধরনের থেকে আধুনিক ধরনে রূপান্তরিত হয়। এই অতিরিক্ত পুঞ্জিভূত পুঁজি আর শুধুমাত্র উন্নত পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণি এবং জনগণকে তাদের জীবনমান উন্নত করার জন্য ব্যবহার করার প্রয়োজন মনে করে না। অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ যেখানে পুঁজির বিনিয়োগ কম, জমি অনেক সস্তা এবং শ্রমিকের শ্রমের মূল্য যথেষ্ট কম সেই সব দেশে পুঁজি রপ্তানি করে এক অভিনব ধরনের উপনিবেশিক অর্থনীতি বিস্তার করে। শুধু উপনিবেশগুলোতে নয়, নির্ভরশীল দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও এভাবে কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উপায়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব বিস্তার করে। লেনিনের বিশ্লেষণে এভাবেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পুঁজিবাদের অসম বিকাশ চূড়ান্ত স্তরে পুঁজিবাদের বিকাশের শর্তগুলো পূরণ করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রশ্রয়ে দেশীয় কর্পোরেটগুলির স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বও ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে।

এই সর্বাধুনিক ধরনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে লেনিন বিশেষ করে জাতীয়তাবাদকে মার্ক্স এঙ্গেলস-এর চিন্তাভাবনার থেকে আরেকটু এগিয়ে দিলেন। এই প্রসঙ্গে লেনিনের সঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস যেমন পশ্চিম ইউরোপের জাতীয়তাবাদের বিকাশ-এর ক্ষেত্রে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার-এর প্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদকে প্রগতিশীল শক্তি হিসেবে দেখেছিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে লেনিন বিষয়টিকে অন্যভাবে তুলে ধরলেন। তাঁর আহ্বান, তথাকথিত দেশপ্রেম-এর আবেগে ভেসে না গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিজের দেশের পুঁজিবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। কার্যত লেনিন এভাবেই আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী সংকট-এর সুযোগে মার্কসবাদী দল এবং শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক দর্শন কি তা সুস্পষ্ট করে দিলেন।

(১০) **বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতার পুনরুত্থান এবং দেশে দেশে তার অনুশীলন সম্বন্ধে লেনিনের বিশ্লেষণ।**

লেনিন বিশ্বব্যাপী সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দৃষ্টিতে তাঁর আন্তর্জাতিকতার মূল সূত্রটি গ্রহণ করেছেন। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে মার্কস এঙ্গেলস আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ-এর প্রেক্ষিতে পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক চরিত্র এবং দেশে দেশে তার শুধুমাত্র ধরন আলাদার চরিত্র বর্ণনা করেছিলেন। বিভিন্ন দেশে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের পথে বিবর্তনের স্তর পেরিয়ে চূড়ান্ত ক্ষেত্রে শ্রেণিহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা ছিল আন্তর্জাতিকতার মূলসূত্র। তিনি মনে করতেন যান্ত্রিকভাবে কোনও বিশেষ দেশের শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসংগ্রামের রণকৌশলগুলির অন্ধ অনুকরণ কখনই আন্তর্জাতিকতাবাদ নয়। পুঁজিবাদ পণ্য উৎপাদন নির্ভর সমাজে দেশে দেশে ভিন্ন ধরনের রণকৌশল গ্রহণ করে। জাতি রাষ্ট্রের সীমানা থেকে পুঁজিবাদকে উৎখাত করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই হবে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা। প্রথম যুদ্ধকালীন সময়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দ নিজের নিজের দেশের জাতীয়তাবাদকে সুরক্ষিত করবার বাহানায় নিজেদের দেশের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে সহায়তা করেছিল। লেনিন রোজা লুক্সেমবার্গ প্রমুখ বিপ্লবীরা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই অবক্ষয় থেকে প্রকৃত মার্কসবাদী আন্তর্জাতিকতার দর্শন এবং রাজনীতিকে সারা দুনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এভাবেই সূত্রপাত হয় তৃতীয় আন্তর্জাতিকের।

শুরুতে রাশিয়ার বলশেভিকরা জার্মান সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির গোঁড়া মার্কসবাদী তাত্ত্বিক কার্ল কাউটস্কির মার্কসবাদী তত্ত্ব ও অনুশীলনের ব্যাখ্যার আদর্শ অনুসরণকারী ছিলেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রভাব প্রায় বিভিন্ন দেশের তিন কোটি শ্রমজীবী এবং বিপ্লবে প্রত্যয়ী বুদ্ধিজীবীদের ওপর বিস্তৃত ছিল। তাই বিভিন্ন উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লবী সংগ্রাম এবং সম্ভাব্য শ্রমিকশ্রেণির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা রাশিয়ার চলমান বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে হয়তো দ্রুত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে পদক্ষেপের শর্ত নির্মাণ করবে। এইরকম ভাবনাচিন্তার পরিসরেই বিচরণ করছিলেন লেনিন এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা। আর যেহেতু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ একটি সামগ্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থা, সুতরাং দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যই বিশ্ববিপ্লবের পথ মসৃণ করবে। এটাই ছিল তাঁদের ব্যাখ্যা।

এদিকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিশ্বের কাঁচামাল, প্রাথমিক পুঁজি লুণ্ঠন এবং পুঁজির রপ্তানীর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ল পুঁজিবাদী দেশগুলি। উগ্রজাতীয়তাবাদের আবহে শক্তিশালী পুঁজিবাদী দেশগুলি সামরিক অর্থনীতির ওপর জোর দেওয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকটজনিত কারণেই ইউরোপে যুদ্ধের পরিস্থিতি ঘনিয়ে এল।

১৮৯২ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যপন্থী সংস্কারবাদী এবং বামপন্থীরা অধিকাংশই ইউরোপের আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লক্ষ কোটি মানুষের মৃত্যু, সভ্যতার ধ্বংসলীলার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিকের এঙ্গেলসের ঘোষণা। শান্তির পক্ষে সংগ্রামের সমর্থক ছিলেন। এঙ্গেলস জোর দিয়ে বলেছিলেন হয় এই যুদ্ধ ইউরোপে পুঁজিবাদের উৎখাত করে সমাজতন্ত্রের পথে যাত্রার সূচনা করবে। নয়তো এক সর্বব্যাপী সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ গড়ে উঠবে। অবশ্য সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকেই আবার সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম জন্ম নেবে। এদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যতই যুদ্ধের দামামা বাজতে শুরু করল ততই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, তথাকথিত দেশপ্রেম ও যুদ্ধনীতি সংক্রান্ত বিচ্যুতি ও সংস্কারবাদী ঝোঁক বৃদ্ধি পেল।

১৯০৭ সাল থেকেই লেনিন, রোজা লুক্সেমবার্গ, মার্তভ প্রমুখ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে থেকেই যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ এবং বিপ্লব সংক্রান্ত পৃথক ইস্তাহার প্রকাশ করে সংস্কারবাদী নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, আন্তর্জাতিকের নীতি অনুসরণকারী বিভিন্ন সংসদীয় প্রতিনিধিবৃন্দ সংসদে এবং পথে ঘাটে খেটে খাওয়া মানুষকে যুদ্ধ যাতে না হয়, অর্থাৎ শান্তিস্থাপনের জন্য আন্দোলন করতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয় তবে দেশে দেশে আর্থরাজনৈতিক সংকটের সদ্ব্যবহার করে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। আসলে পুঁজিবাদের লগ্নিপুঁজি নির্ভর সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উত্তরণের ক্ষেত্রে উন্নতপুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং উপনিবেশসমূহের জাতীয়তাবাদী চেতনার আন্তঃসম্পর্ক এবং পার্থক্য সম্পর্কে লেনিন সহ রোজা, লেবনেখ্‌ট প্রমুখের ভাবনার সঙ্গে আন্তর্জাতিকের প্রবীণ নেতৃত্বের মতভেদের ফাটল ক্রমশ বেড়ে উঠছিল।

ইতিমধ্যে রুডলফ হিলফারডিঙের 'ফিনান্স ক্যাপিটাল', রোজার 'দি এ্যাকুমুলেশন অফ ক্যাপিটাল', বুখারিনের 'ইম্পিরিয়ালিজম এ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ইকনমি', বিশেষ করে লেনিনের 'ইম্পিরিয়ালিজম, দি হায়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম' সাম্রাজ্যবাদের আধুনিক ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যবান ব্যাখ্যা সংযোজিত করেছে।

লেনিন উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শ্রমিক শ্রেণির উপর তাদের রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক শাসকদের কুপ্রভাব জনিত উগ্রজাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বকে সচেতন করে দিচ্ছিলেন। তিনি সাময়িক হলেও এই সুবিধাবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যুদ্ধ ও সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতির আহ্বান রেখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক দেশের সামগ্রিক জাতীয়তাবাদী মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে ইউরোপ আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনকে আরো সংহত হওয়ার উপর জোর দিচ্ছিলেন।

এসব সত্ত্বেও ইউরোপে ১৯১৪ সালের জুলাইয়ে বিশ্বযুদ্ধের আবহ শুরু হতে লাগল। অন্যদিকে লেনিন- রোজা প্রমুখের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করে গোঁড়া মার্কসবাদী তাত্ত্বিক কাউটস্কি, প্রমুখ সংস্কারবাদী জাতীয়তাবাদে আচ্ছন্ন হয়ে নিজের নিজের জাতি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার স্বার্থে যুদ্ধের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণিকে বিভ্রান্ত করলেন। এভাবেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন আসন্ন হয়ে উঠল এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ভ্রূণ জন্ম নিল, লেনিন, রোজা, কার্ল লেবনেখ্‌ট প্রমুখের প্রচেষ্টায়।

রাজ্যের কৃষকের আত্মহত্যা : একটি তথ্যানুসন্ধানী রিপোর্ট

গত এক মাসে পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বেশ কিছু কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। নিম্নচাপের ফলে হওয়া অকাল বর্ষণে দামোদর নদীর অববাহিকা অঞ্চলে যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ধান, আলু, পেঁয়াজ, সবজি সহ সমস্ত ফসলেরই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরেই টানা চাষে ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে বাংলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের। কৃষিতে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ কার্যত অমিল, ফলে চাষের ক্রমবর্ধমান খরচ জোগাতে স্থানীয় মহাজন, মাইক্রো ফিন্যান্স সংস্থা ইত্যাদির কাছে চড়া সুদে চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। ঋণের ফাঁসে ক্রমাগত জড়িয়ে যাওয়ার ফলে তৈরি হওয়া তীব্র মানসিক অবসাদ এঁদের অনেককেই ঠেলে দিচ্ছে আত্মহত্যার পথে। বাকিরা কোনোমতে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে লড়াই করছেন, বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজের জমি জায়গা বাসস্থান ছেড়ে দিনমজুরের কাজ নিতে বাধ্য হচ্ছেন ভিন রাজ্যে। এমনই একজন আত্মঘাতী কৃষক পূর্ব বর্ধমানের গলসী থানার অন্তর্গত ভুড়ি গ্রামের লিয়াকত আলী।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ ঋণমুক্তি সমিতির পক্ষ থেকে গত ১১ ডিসেম্বর একটি দল মৃতের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারবর্গ ও পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই দলে ছিলেন অধ্যাপক সৌম্য শাহীন, অমিতাভ চক্রবর্তী, মৃন্ময় সেনগুপ্ত, সত্যজিৎ দাশগুপ্ত, সুশোভন ধর, শঙ্খশুভ্র বিশ্বাস প্রমুখ। প্রাথমিকভাবে লব্ধ তথ্য নীচে দেওয়া হলো।

মৃতের নাম : লিয়াকত আলী, বয়স : ৬২, পেশা—কৃষক. আবাস–গ্রাম: ভুড়ি, থানা : গলসী, জেলা : পূর্ব বর্ধমান।

পরিবার : ১. শেখ আজিমা, স্ত্রী, বয়স : ৫৫, পেশা : গৃহকর্ম।

২. আজিজলু হক, পুত্র, বয়স : ৩৫, পেশা : লরি চালক।

৩. মানোয়ারা বেগম, পুত্রবধু, বয়স : ২৬, পেশা : গৃহকর্ম।

৪. শেখ আতিফ, বয়স : দেড় বছর।

মৃত্যুর কারণ : চাষে ক্ষতি ও ঋণগ্রস্ততার কারণে গাছের ডালে দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা।

তারিখ : ২৭ নভেম্বর, সময় : সকাল সাড়ে সাতটা। স্থান : ভুড়ি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিকট।

ঋণের পরিমাণ :

১. পূর্ব বর্ধমান গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উড়াচাটি শাখা থেকে ৫০,০০০ টাকার গোষ্ঠী ঋণ।

২. ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, গলসী শাখা থেকে ঋণ।

৩. চাষের উপকরণ কেনার দরুণ স্থানীয় মহাজনের থেকে লক্ষাধিক টাকা ঋণ।

মোট ঋণের পরিমাণ তিন লক্ষাধিক টাকা (সঠিক পরিমাণ মৃতের আত্মীয়দের অজানা)। এছাড়াও ঋণের ওপর জমা সুদ ধরলে মোট দায় পাঁচ লক্ষেরও বেশি।

ছেলে আজিমুল হাতে চোট পাওয়ার ফলে গত ছ মাস ধরে কর্মহীন। বৃদ্ধ লিয়াকত শেখের ওপরে পড়েছিল পাঁচজনের সংসার চালানোর ভার। পারিবারিক দু' বিঘা জমি ছাড়াও আরো চার বিঘা জমিতে ভাগচাষ করেছিলেন লিয়াকত। বিঘা প্রতি গড়ে ছয় বস্তা করে ধান উৎপাদন করেছিলেন তিনি। প্রতি বস্তায় ৬০ কেজি চাল, অর্থাৎ মোট ২ কুইন্টালের কিছু বেশি ধান চাষ করেছিলেন তিনি। অকাল বর্ষণের ফলে সমস্ত ধান ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। ঋণের ফাঁসে ক্রমাগত জড়িয়ে যাওয়ার তীব্র মানসিক অবসাদে নভেম্বর মাসের ২৭ তারিখে ভুড়ি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন লিয়াকত।

ঋণমুক্তি সমিতির পক্ষ থেকে আমরা তাঁর পরিবার প্রতিবেশীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। সেই আলাপচারিতার সূত্রে জানা যায় যে এলাকার অধিকাংশ চাষীই রাজ্য সরকারের কৃষকবন্ধু, কেন্দ্রীয় সরকারের কিষাণ নিধির মতো প্রকল্পের সুযোগ পাচ্ছেন না। নিয়ম অনুযায়ী সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে চাষের জমির বৈধ পরচা, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও নিজের নামে 'আপডেট' করা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে। ভাগচাষিকে সে সুবিধা পেতে হলে, পরচায় তাঁর নামের উল্লেখ থাকতে হবে। সেখানে কী চুক্তিতে ভাগ চাষ হচ্ছে, তার উল্লেখও থাকতে হবে। অভিযোগ উঠেছে যে, বর্তমানে জমির মালিকদের একটা বড় অংশ ভাগচাষিদের বৈধ নথিপত্র দেন। চাষ হয় মৌখিক চুক্তিতে। সেই কারণে ভাগচাষিদের একটা বড় অংশ ওই সব প্রকল্পের সুবিধার বাইরে থাকেন। জমি-মালিকদের একাংশও আবার ঠিকঠাক পরচা না থাকায় প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একই কথা প্রযোজ্য শস্য বীমা বা কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রেও। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমির ক্ষেত্রে অনেকসময় বর্তমান প্রজন্মের কৃষক পর্চায় নাম পরিবর্তন করতে পারেন না। শিক্ষার অভাব, নিয়মকানুন সম্বন্ধে অজ্ঞতা, পঞ্চায়েতের অসহযোগিতা ও সর্বোপরি সরকারি দফতরে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বহু চাষীর কাছেই তাই জমির যথাযথ নথি নেই।

এবার একটু চাষের খরচের একটা খসড়া হিসেব দেওয়া যাক।

বীজ ধান : ৯০ কেজি। প্রতি বিঘায় দশ কেজি করে মোট ৯০০ টাকা। সাব মার্সিব্‌ল পাম্পের খরচ : ১২০০ টাকা বিঘা। ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট : ৩২ টাকা কেজি বিঘা। বিঘা প্রতি ২৫ কেজি করে মোট ৮০০ টাকা। ইউরিয়া : ১০ টাকা কেজি। বিঘা প্রতি ১০ কেজি করে মোট ১০০ টাকা। ট্রাক্টর ভাড়া : ঘণ্টা প্রতি ১৪০০ টাকা। প্রতি বিঘা চাষে দেড় ঘণ্টা ট্রাক্টর ব্যবহারে মোট খরচ ২১০০ টাকা। শ্রম : ধান রোয়ার সময় বিঘা প্রতি ১০ শ্রমদিবস এবং নিড়োনোর সময় ৪ শ্রম দিবস। মজুরি : ৩৫০ টাকা দিনে। মোট ৪,৯০০ টাকা। কীটনাশক : ২০০০ টাকা।

মোট বিঘা প্রতি চাষের খরচ : ১২০০০ টাকা। সুদ : শতকরা ৩ টাকা প্রতি মাসে (চক্রবৃদ্ধি হারে)। মোট ৩৬০ প্রতি মাসে।

ঋণ শোধের গড় সময় ছয় মাস ধরে মোট ২,১৬০ টাকা।

স্বামীনাথন কমিশনের C2 সূত্র অনুযায়ী মোট খরচ বিঘা প্রতি ১৪,১৬০ টাকা। এ বছর পশ্চিমবঙ্গে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ১৯৪০ টাকা কুইন্টাল। বর্ষায় গড়ে বিঘা প্রতি বস্তা (৬০ কেজির) ধান উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ, মোট বিঘা প্রতি উৎপাদন প্রায় এক কুইন্টাল।

অর্থাৎ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পেলে বিঘা প্রতি আয় ১৮,৬০০ টাকা। সেক্ষেত্রে সরকারি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পেলে বিঘা প্রতি লাভ ৪,২০০ টাকা। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরকার ধান ক্রয় করলে সেই ধানের দামস্বরূপ অর্থমূল্য সরাসরি চাষীর ব্যাঙ্ক একাউন্টে যায়। এই প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। যথাযথ সরকারি নথি না থাকলে একজন চাষী ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পান না। কিন্তু বহু প্রান্তিক চাষী অপেক্ষাকৃত কম দামে অভাবী বিক্রয় করতে বাধ্য হন। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে ভাগচাষী জমির মালিক বা মহাজনের কাছে ধান বিক্রি করতে আগে থেকেই চুক্তিবদ্ধ থাকেন।

এ বছর ধানের বাজার মূল্য ছিল ৮২০ টাকা বস্তা। এই দামে বিক্রি করলে বিঘা প্রতি মোট আয় ৮২০ × ১৬ = ১৩১২০ টাকা। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে একজন চাষীর বিঘা প্রতি প্রায় হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে। এরপর বিরূপ প্রাকৃতিক অবস্থার কারণে ধান নষ্ট হলে তো কথাই নেই। শস্য বীমা কার্যত অমিল হওয়ায় কৃষক পড়ে যাচ্ছেন ঋণের ফাঁদে। বন্যার ফলে অনেকেই দ্বিতীয়বার ধান রুইতে বাধ্য হওয়ায় খরচ আরো বেড়েছে।

দক্ষিণ দমদম পৌর নির্বাচনে

জলনিকাশী ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোই হোক প্রধান দাবি

আসন্ন চারটি পৌরনিগম নির্বাচনের পর পশ্চিমবাংলার বাকী সমস্ত পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। ইতিমধ্যে কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচন শেষ হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ১১৫টি পৌরসভা আছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ২৪টি পৌরসভার মধ্যে দক্ষিণ দমদম পৌরসভা আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে একটি বৃহৎ ও শতাব্দী প্রাচীন পৌরসভা। এর আয়তন ১৩.৫৪ বর্গ কিমি. এবং জনসংখ্যা ৪, ০৩,৩১৬ (২০১১ সালের আদমসুমারি অনুসারে) এবং এই পৌরঅঞ্চলের বর্তমান ভৌগোলিক পরিসীমা হলো, ভি আই পি রোডের দক্ষিণদাড়ি থেকে শ্রীভূমি, লেকটাউন, বাঙ্গুর, দমদম পার্ক হয়ে পাতিপুকুর রেল ব্রীজ পর্যন্ত এবং রেললাইন ধরে সুভাষনগব, গড়ুই মাঠকল সহ সংযোজিত অঞ্চল (পূর্বে পঞ্চায়েতের অধীন), আর এন গুহ রোড, পাদ্রীহাটা হয়ে দমদম সেন্ট্রাল জেল মোড়ের বাঁ দিক ধরে নাগেরবাজার সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন (১৯৯৩) অনুসারে পৌর অঞ্চলগুলোকে যে পাঁচটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে প্রেসিডেন্সি বিভাগের ৪৮টি পৌরসভার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণ দমদম পৌরসভা অন্যতম। দক্ষিণ দমদম অঞ্চলে সাক্ষরতার হার ৮৩ শতাংশ, যেখানে ভারতে সেটি ৫৯.৫ শতাংশ। পৌরআইনে অঞ্চল পুনর্বিন্যাসের পূর্বে দক্ষিণ দমদমে ওয়ার্ড ছিল ২৫টি। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৩৫। পৌরসভা পরিচালনার দায়িত্বে যখন বামফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত দলগুলো ছিল, তখন তাদের ওয়ার্ডভিত্তিক আসন ছিল সিপিআই (৩), আরএস পি (২), ফরওয়ার্ডব্লক (২) এবং বাকীগুলো সিপিআই(এম) -এর অধীনে। ২০১১-তে রাজ্যের শাসনক্ষমতার পালাবদলের সাথে সাথে পৌরসভাও বামেদের হাতছাড়া হয়। ২০১৫ পৌর নির্বাচনে ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে মাত্র ৩টি ওয়ার্ড বামেদের দখলে আসে। দীর্ঘ দশ বছর তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পৌরবোর্ডে একচ্ছত্র পৌরশাসন কায়েমের ফলে নাগরিক পরিষেবা অনেক ক্ষেত্রেই প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য পৌরসভার মতো এই পৌরসভাও সঠিক সময়ে নির্বাচন না করে পৌর প্রশাসক ও প্রশাসকমণ্ডলী গঠন করে নিজেদের মতো করে। দক্ষিণ দমদমে বসবাসকারীদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত, তবে অতি অল্প সময়ের জন্য আসা মানুষের সংখ্যা একেবারে কম নয়। এই পৌরঅঞ্চলে ছোট বড়ো অনেক কলকারখানা ছিল কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক কারণে অধিকাংশই বন্ধ হয়ে গেছে এবং ঐ সমস্ত কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে তারা কোনভাবে দিন গুজরান করছেন। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিছু মানুষ কোলকাতার অফিস কাছারিতে কোনভাবে নিযুক্ত হয়ে দিন যাপন করছেন। এককথায় তারা চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে রয়েছেন।

সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবা দেবার দাবিকে সামনে রেখে এবার যে পৌরনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তার মধ্যে সর্বাগ্রে জলনিকাশী ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হবে প্রধান কর্তব্য। এ অঞ্চলে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা খুবই নিম্নমানের। বাগজোলা খালে পলি পড়ে নাব্যতা হারিয়েছে; যার ফলে সামান্য বৃষ্টিতে বেশ কিছু অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। মুখ্যত এ কারণে নাগরিক জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল বাগজোলা খাল ঠিকমতো ড্রেজিং (পলি মুক্ত করা) হয় না। রাস্তায় বা পাড়ায় পাড়ায় ড্রেনের উপর স্ল্যাব ফেলে দেওয়ায় এবং ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার না করায় অঞ্চলে মশার উপদ্রব বেড়েই চলেছে। প্রসঙ্গত, বছর চার আগে এই অঞ্চলে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং শতাধিক মানুষ মারা যায়। পলতা থেকে পানীয় জল এখনও সব ঘরে পৌঁছায়নি। বস্তি অঞ্চলে পানীয় জল সংগ্রহের জন্য মা-বোনদের দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অঞ্চলে একটি দমকল কেন্দ্র ছিল, সেটি এখান থেকে বিধাননগরে স্থানান্তরিত হয়। এ অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে দমকলের সহায়তা পেতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়। সে কারণে এখানে একটি দমকল কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি। এই পৌরসভার অধীনে যে কয়টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল সেগুলোর আর তেমন কোনো অস্তিত্ব নেই। শিক্ষার প্রসারে ঐ ধরনের বিদ্যালয় অবিলম্বে চালু করা প্রয়োজন।

আসন্ন পৌর নির্বাচনে উপরিউক্ত দাবিসহ অন্যান্য নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত দাবি নিয়ে বামদলগুলোর ঐক্যবদ্ধ লড়াই খুবই জরুরি এবং তার প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

সংবাদদাতা : সনৎ ঘোষ

গত সংখ্যার গণবার্তায় কলকাতা কর্পোরেশনে নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশে মুদ্রণ প্রমাদ হয়েছিল। কম. শিখা মুখার্জী—৯৯ নং ওয়ার্ডে ৩১.৪৩ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এমন অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা অনুতপ্ত। —স.ম. গণবার্তা

Vol. 68 Issue No. 41 শনিবার ১ জানুয়ারি, ৮ জানুয়ারি ২০২২ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

রাজ্যে বাড়ছে কৃষক আত্মহত্যা, সরকার অস্বীকার করেই চলেছে

সংবাদমাধ্যমে একের পর এক কৃষক আত্মহত্যার খবর উঠে আসছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে নিম্নচাপের বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে চাষের ব্যাপক ক্ষতির সঙ্গে আত্মহত্যার সম্পর্ক বুঝতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী জেলায় আত্মহত্যার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। যদিও কৃষির ক্ষতি বা দেনার দায়ে আত্মহত্যার কথা প্রশাসন ও সরকার বেমালুম চেপে যায়। সাংসারিক অশান্তি, মানসিক অবসাদ, প্রেমে ব্যর্থতা—কোনো না কোনো একটা কারণ দেখাতেই প্রশাসন ব্যস্ত। অথচ, সংবাদমাধ্যমেই উঠে আসছে, আত্মঘাতী কৃষকদের চাষে ক্ষতির কথা। উঠে আসছে দেনার কথা, সরকারি কোনো সুযোগ না পাওয়ার কথা। কেউ ধান চাষ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন, কেউ বা আলু বসিয়ে। আনাজও মাঠে নষ্ট হয়েছে।

রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের বড় অফিসার অম্লান বদনে বলেছেন যে, সরকার নানা প্রকল্পেই সাহায্য দেয়। একজন আবার সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন যে, কেউ কেউ লোভে পড়ে অন্য সংস্থা থেকে চড়া সুদে ঋণ নিচ্ছেন। সরকার তথা শাসক পক্ষের এইসব উক্তি খুবই চেনা। বহু ব্যবহারে ক্লিশেও হয়ে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেও এমন অনেক কথা বলা হয়। কৃষকদের দ্বিগুণ বা তিনগুণ আয় বাড়ার মিথ্যা প্রচারের পর্দা ফাঁস করতে কেই বা চায়! বাস্তব সত্য হারিয়ে যায়।

ফসলের দাম না পাওয়া, অভাবী বিক্রি এখন রাজ্যে স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সাংসারিক অশান্তি বা মানসিক অবসাদের কারণ যে অনটন, দেনার আতঙ্ক তা সরকার স্বীকার করে না। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বহু সংখ্যক মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিগুলির বাড়িতে ধেয়ে এসে অপমান, হুমকি। ফসলের সঠিক দাম পাওয়া অনেক কঠিন, তার চেয়ে সহজ আত্মহত্যা। অশান্তি, অবসাদ, টেনশনের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে চিরমুক্তির গ্যারান্টি।

একেই অতিমারিতে পরিবহণ স্বাভাবিক না থাকায়, বাজার ঠিকমতো না বসায় ফসলের দাম মেলেনি। তার সঙ্গে বেড়ে চলেছে সার, বীজ, কীটনাশকের দাম। সেচের খরচ। লোকসান চলতেই থাকলে দেনার দায়ে ডোবা ছাড়া উপায় কী? আজকের কৃষি সঙ্কটকে শুধুমাত্র অতিবৃষ্টি বা অতিমারির কারণ বললেই হবে না। সঙ্কট অনেক গভীরে। দুর্যোগ যাকে আরও প্রকট করেছে মাত্র। রাজ্যের কৃষক আন্দোলনের সংগঠকদের এপ্রসঙ্গে আরও যত্নশীল হতে হবে।

বড় চাষি লোকসান পুষিয়ে নিতে পারেন। তাঁর পুঁজি আছে। ফসল বিক্রিরও তাড়া থাকে না। ফসল রেখে দাম বাড়লে বা সরকার ফসল কিনলে বিক্রি করেন। কিন্তু প্রান্তিক কৃষক, অন্যের জমিতে চাষ করা কৃষকের টাকা তাড়াতাড়ি দরকার। ধার মেটাতে হবে, পরের ফসল ফলাতে হবে, দাদন নিলে মহাজনকে বা চুক্তি অনুযায়ী জমির মালিককে টাকা বা ফসল দিতে হবে। সরকার, বাজার কেউ তার কথা ভাবে না। বাজার অর্থনীতি চলে তার লাভের অঙ্কে আর সরকার চলে সেই অর্থনীতিকে তেল দিয়ে।

প্রশ্ন উঠবে, তা'হলে সরকারের এত প্রকল্প, বীমা, কৃষি উপকরণ দেওয়ার ব্যবস্থা, ঋণদান তার ফল কারা পাচ্ছে? সবই ঠিক করে দিচ্ছে কাগজ। এন আর সি বিরোধী আন্দোলনের সময় আওয়াজ উঠেছিল ঃ 'রক্ত দিয়ে কেনা জমি, কাগজ দিয়ে নয়'। 'আমরা কাগজ দেখাবো না'। কাগজের সঙ্গেই জড়িয়ে গেছে মানুষের অস্তিত্ব। নাগরিকত্ব থেকে পেশা সব। রাষ্ট্রের ঠিক করে দেওয়া কাগজ চাই। চাষ করলেই হবে না, জমির কাগজ চাই। আর এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে জটিল ভূমি সম্পর্ক। অপারেশন বর্গা, খাস জমির পাট্টার লড়াই, ভূমি সংস্কার নিয়ে এত গর্বের পরেও কাগজ ছাড়া কৃষকের অস্তিত্ব নেই। আর বিশাল সংখ্যক কৃষকের ঠিকমতো কাগজও নেই।

পূর্বপুরুষের নামে জমি। পরচায় নাম না বদলালে সরকারি সুযোগ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। পূর্ব বর্ধমান জেলায় আত্মঘাতী কৃষকদের মধ্যে তিনজনের উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিকানা থাকলেও, পরচায় নিজের নাম ছিল না। তাই তাঁরা নাকি সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পান নি। এমনটাই জানাচ্ছে সংবাদমাধ্যম। আর যারা অন্যের জমিতে চাষ করেন? খাস জমিতে বহু বছর, এমনকী দু'পুরুষ চাষ করেও অনেকে পাট্টা পান নি।

বর্গা চাষে নাম নথিভুক্ত নেই। সে জমিও মালিক আর পঞ্চায়েত—সরকারি দপ্তরের একাংশের কারসাজিতে হয়ত কাগজে আর চাষের জমি নেই। চাষের জমি হয়ে গেছে বাস্তু জমি। ভাগ চাষের ক্ষেত্রেও বেশিরভাগই নিয়ম অনুযায়ী লিখিত থাকে না। ভাগচাষির সঙ্গে জমির মালিকের বন্দোবস্ত হয় মুখের কথায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল বা টাকা দেওয়ার মৌখিক চুক্তিতে। ফসল নষ্ট হলেও মালিককে টাকা দিতেই হবে। কোনো ক্ষেত্রে আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমির মালিককে আগে দিয়ে চাষ করতে হয়। জমি উর্বর হলে অর্থের পরিমাণও মোটা অঙ্কের। ফসল নষ্ট হলে বা দাম কম পেলে কৃষকের টাকার পুরোটাই প্রায় জলে যায়। অন্যের জমি চাষ করা কৃষকের পাট্টা, বর্গাচাষি হিসেবে নথিভুক্তি, ভাগচাষি হিসেবে নাম না থাকলে কৃষকবন্ধুর সুবিধে মেলে না। মেলে না কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, ক্ষতিপূরণ বা অন্য সুযোগ। শস্যবীমার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা।

এখন আবার এদের কিছু ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েতের মাতব্বরদের সার্টিফিকেট নিয়ে আসার কথা বলা হচ্ছে। বঞ্চিত, সর্বস্বান্ত কৃষকদের শাসক ও রাষ্ট্রের দয়ায় বাঁচতে বাধ্য করার আরেক ফন্দি। প্রতিবাদ করলেই সার্টিফিকেট মিলবে না। ভূমিহীন কৃষকের তো বটেই, জমির মালিকেরও পরচায় নিজের নাম না থাকলে ওয়ারিশন সার্টিফিকেট পেতে হয়রান হতে হয়। চাষ না করেও মালিকানার কাগজ থাকলে ক্ষতিপূরণ, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে অল্প সুদে ঋণ, বীমা বা অন্য সুবিধে দিব্যি মেলে। কোনো কোনো জমির মালিক লিজে জমি চাষ করতে দিয়ে অর্থ পান, আবার সরকারি সুযোগও পান। ভূমিহীন কৃষক দেনার দায়ে ডোবেন আর চাষ না করলেও মালিক অতি সামান্য সুদে ঋণ পান। সরকার হিসেব কষে দেখায় কতজন কৃষক উপকৃত হচ্ছেন। অন্যের জমিতে চাষ করা কৃষক যখন মরতে বসেছেন, তখন অনেক মালিকের কাছে অবৈধ অর্থ উপার্জনের পথ খুলেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার আত্মঘাতী এক কৃষক বেশিরভাগটাই ভাগ চাষ করতেন। বৃষ্টিতে ধান নষ্টে দেনা না মেটাতে পাওয়ার আতঙ্কে ভুগছিলেন।

জমির মালিকানা থাকলেই যে ক্ষতি হবে না তা নয়। কৃষক বন্ধুর টাকাতে সেই লোকসান মেটানো যায় না। জমির পরিমাণ কম হলে টাকাও কম। শস্যবীমা বা ক্ষতিপূরণও পর্যাপ্ত নয়। টাকা আসতেও দেরির অভিযোগ ওঠে। আর দাম কম পেলে সেই ক্ষতি পূরণ করার বন্দোবস্ত নেই। সমবায় বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ঋণ না পেয়ে কৃষক মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিগুলির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। সংসারের অন্য কাজের জন্য নেওয়া ধারও চাষের কাজে খরচ হচ্ছে। কোম্পানিগুলি আইনসম্মত পথে আধুনিক মহাজন। নিয়ম মানার বালাই নেই। গ্রামে গ্রামে ব্যবসা বাড়াচ্ছে, নানা নামের কোম্পানি। বড় বড় কোম্পানি ও কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটির (সি এস আর) নামে সুদের কারবার চালাচ্ছে। উচ্চহারে সুদ, ঋণের শর্ত পরিষ্কারভাবে না জানিয়ে কৃষকদের ঋণে জড়াচ্ছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অপমান, হুমকি সবই চলছে বেআইনিভাবে। সমবায় বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে ঋণ পেতে রয়েছে নানা শর্ত, হয়রানি। মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিগুলি বাড়ি এসে ঋণ দেয়। সরকারি নানা ঋণের প্রকল্পগুলি নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচারও ঠিক মতো হয় না।

প্রতিটি ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ও তা কৃষকের থেকে সরাসরি কেনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছাড়া প্রান্তিক, অন্যের জমিতে চাষ করা কৃষকদের রক্ষা করা যাবে না। দেশজোড়া ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন এই দাবিকে সামনে এনেছে। আমাদের রাজ্যে একটি-দুটি ফসল বাদ দিলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সরকারের ফসল কেনার ব্যবস্থাটাই নেই। সেই ব্যবস্থাও দুর্বল। প্রান্তিক চাষি, ভূমিহীন চাষির বিশেষ উপকারে আসে না। ভূমি সম্পর্কের জটিল বিষয়টি নিয়ে সঠিক তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন। অপারেশন বর্গা, পাট্টা নিয়ে এত লড়াইয়ের পর আজ কেন এই অবস্থা? সে লড়াইকে এখন অনেকেই সেকেলে মনে করেন। কেন ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, প্রান্তিক কৃষক জমি রাখতে পারছেন না তা নিয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

তৃণমূলের আমলে নতুন করে বর্গা, পাট্টা দেওয়ার কাজ প্রায় বন্ধ। তৃণমূল সরকারের আমলে এভাবেই কৃষি ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে কর্পোরেট নির্ভর করে তোলা হচ্ছে। ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও কৃষকের হাতে জমির দাবিতে আন্দোলনই পারে এই সমস্যার সমাধান করতে।

লক ডাউনে 'কুনাট্য' এবং শ্রমজীবী মানুষ

৫-এর পাতার পর

বলেছিলেন "কোল্যাটেরাল ড্যামেজ"। এই পুরো ভাষ্যে অর্থনীতির ভূমিকাকে না বুঝলে তা খণ্ডদর্শন হবে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতারা নীতিনির্ধারণ করেন পুঁজির স্বার্থে। সেই নীতির স্বপক্ষে সামাজিক মান্যতা নির্মাণ করে নাগরিক সমাজ। তাই মূলধারার সংবাদমাধ্যম ও বুদ্ধি ব্যবসায়ীরা যখন প্রয়োজন তখন আতঙ্ক বাড়াচ্ছেন, আবার যখন প্রয়োজন তখন সমস্ত সতর্কতা ভুলে বাঁধভাঙা উল্লাসে মদত দিচ্ছেন। এই গোটা কোভিড মিসম্যানেজমেন্টের পিছনে প্রযুক্তিগত উন্নতির অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অটোমেশনের ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক আজ উদ্বৃত্ত। এক ধাক্কায় অধিকাংশ কর্মী ছাঁটাই করলে তা দেশব্যাপী ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম দিতে পারে। তাই ধাপে ধাপে লকডাউনের মধ্য দিয়ে গণবেকারত্বের স্বাভাবিকিকরণ করা চলছে। লকডাউন উঠে গেলেও কাজ ফেরত না পাওয়া শ্রমিক নিজের ভাগ্য আর জীবাণুকেই দোষারোপ করছেন, মালিকপক্ষ বা রাষ্ট্রকে কোন দায় নিতে হচ্ছে না। কাজের অধিকার কেড়ে নিয়ে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে খয়রাতির টাকা। পাঁচশো টাকার নগদমূল্যে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মানুষের আত্মসম্মান এবং রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা। বাবুদের শিশুরা যখন অনলাইনে ক্লাস করে ভবিষ্যতের শ্রমের বাজারের জন্য নিজেদের উপযোগী করে তুলছে, খেটে খাওয়া পরিবারের সন্তানরা তখন নিঃশব্দে শিশু শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে, পড়ে থাকছে লেখাপড়া শিখে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্নের শব।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই জাদু বাস্তবের পরিস্থিতিতে নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে হিমশিম খাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে যেসব দল, তাদের নেতৃত্বে চিরকালই ট্র্যাডিশনাল ইন্টেলেকচুয়ালদের ভিড়। ফলে বাজার অর্থনীতির যুক্তিগুলোই তাদের ভাষ্যে উঠে আসে, শুধু তার গায়ে পরানো থাকে মার্ক্সিস্ট জার্গনের অলঙ্কার। বামপন্থীদের এই দোটানার সুযোগে দক্ষিণপন্থীরা ইতিমধ্যে দশ গোল দিয়ে চলে গেলো, আর আমরা তাদেরই মধ্যেকার প্রগতিশীল অংশকে চিহ্নিত করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার খোয়াবে মগ্ন!! ২০২৪এ বিজেপি সরকার গড়ুক বা মিলিজুলি সরকার হোক, বামপন্থীদের কোন রকমের নির্বাচন পূর্ববর্তী জোট বা প্রি-পোল অ্যালায়েন্সে যাওয়া উচিত নয়। সংসদ বহির্ভূত গণ আন্দোলনগুলোর সাথে সংসদীয় রাজনীতিকে কিভাবে মেলানো সম্ভব, তার সৃজনশীল অনুশীলনই পারে বামপন্থাকে শক্তিশালী করতে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ দেউচা পচামিতে কয়লা খনি বা ঠুড়গা বাঁধ প্রকল্পের বিরোধিতা, সুন্দরবন নদী বাঁধ ও জীবন জীবিকা বাঁচানোর আন্দোলন ইত্যাদির পাশে দাঁড়ানো।

নাগরিকত্ব আইনবিরোধী আন্দোলনের সময় যেরকম টোকেনইজম হয়েছিল, সেই জাড্য ছেড়ে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। যে সম্ভাবনা ভাঙ্গরের জমি জীবিকা ও বাস্তুতন্ত্রের আন্দোলন দেখিয়েছিল। যে কারণেই হোক, এক বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা সেখানে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। এই পুরোনো ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, মানুষের কাছে শেখার মনোভাব বজায় রাখতে হবে। এমফিল-পিএইচডি করা প্রার্থীদের পাশাপাশি খনি শ্রমিক, কারখানা বা কৃষি মজুর, গিগ অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে থাকা ছেলেমেয়েদের নেতৃত্বে আনতে হবে। তৃণমূল বিজেপি দুটো দলই আত্মপরিচয়ের রাজনীতির ফাঁদ পাতবে '২৪এ, সেগুলোকে সচেতনভাবে এড়িয়ে শ্রেণি ঐক্যের ভাবনাকে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কৃষি আন্দোলনের মঞ্চ থেকে শ্রম কোড বাতিলের দাবির কথা স্মরণ করুন। ট্রেড ইউনিয়নগুলো কিভাবে কৃষকদের দাবিতে পথে নেমেছিল, তা থেকে শিক্ষা নিন। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপস করেনি বলে কৃষকরা ফ্যাসিস্টের চোখে চোখ রেখে লড়াই চালাতে পেরেছেন এবং আপাতত জিতেছেন। কৃষি আন্দোলনের বহু সীমাবদ্ধতা সত্বেও এটা কিন্তু একটা বিরাট প্রাপ্তি।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-